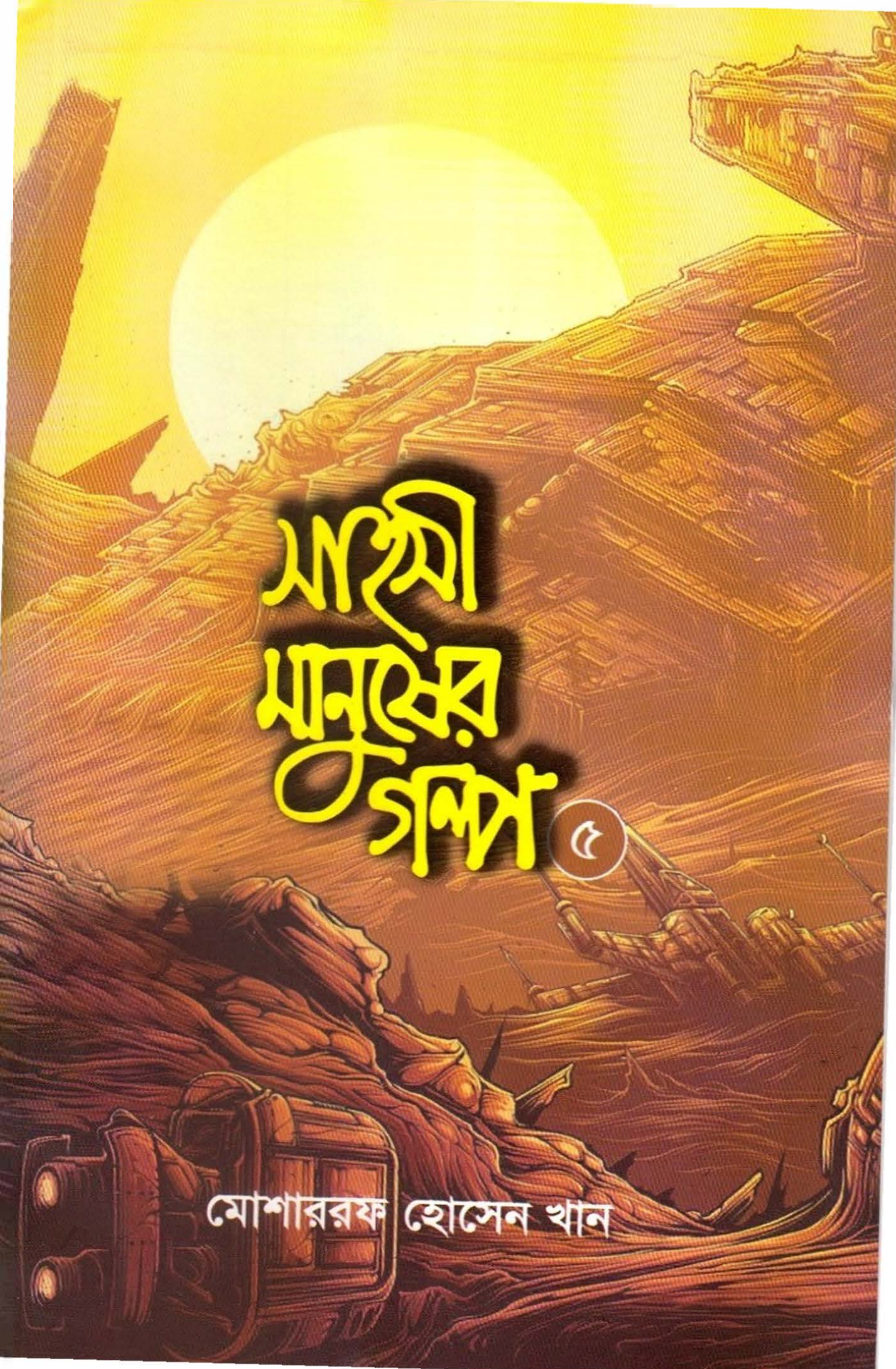
সাহসী মানুষের গল্প
৫
মোশাররফ হোসেন খান

সাহসী মানুষের গল্প

৫

মোশাররফ হোসেন খান

আইসিএস পাবলিকেশন

www.nagorikpathagar.org

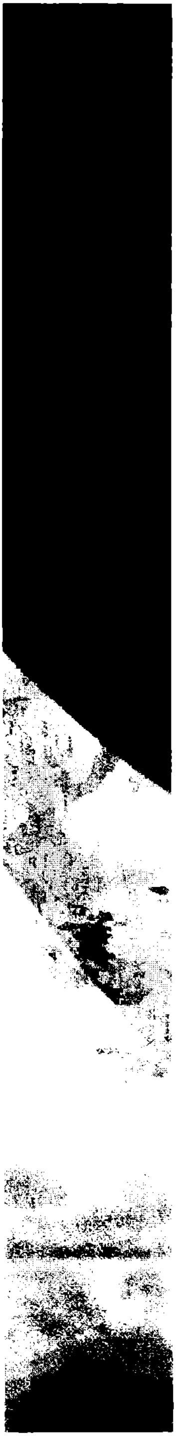

সাহসী মানুষের গল্প-৫
মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়
আইসিএস পাবলিকেশন
৪৮/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৪৪০

প্রকাশকাল
এপ্রিল-২০১৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মোজাম্মেল হক মজুমদার

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

www.nagorikpathagar.org

গল্পসূচি

শহীদি কাফেলায় তিনিও শামিল	● ৪
বিজয় হাসে নীলাকাশে	● ১৯
পানির ধারে ন্যায়ের পথিক	● ২২
ভালোবাসার বিশাল আকাশ	● ২৫
সেই এক মানুষ সাগর সমান	● ২৯
সাহস যেন বাউরি বাতাস	● ৩৪
সেনাপতির নির্দেশ	● ৩৯
সে যেন অসীম দরিয়া	● ৪৬
আগুনের পাহাড়	● ৫৩
সাগর তলে মানিক জ্বলে	● ৫৮
জোয়ার যখন জাগে	● ৬৬
ঢেউ ভাঙা সাম্পান	● ৭২
মা-তো নন, সাওর পর্বত	● ৭৮
আলোর মিছিলে মহান কবি	● ৮৫

www.nagorikpathagar.org

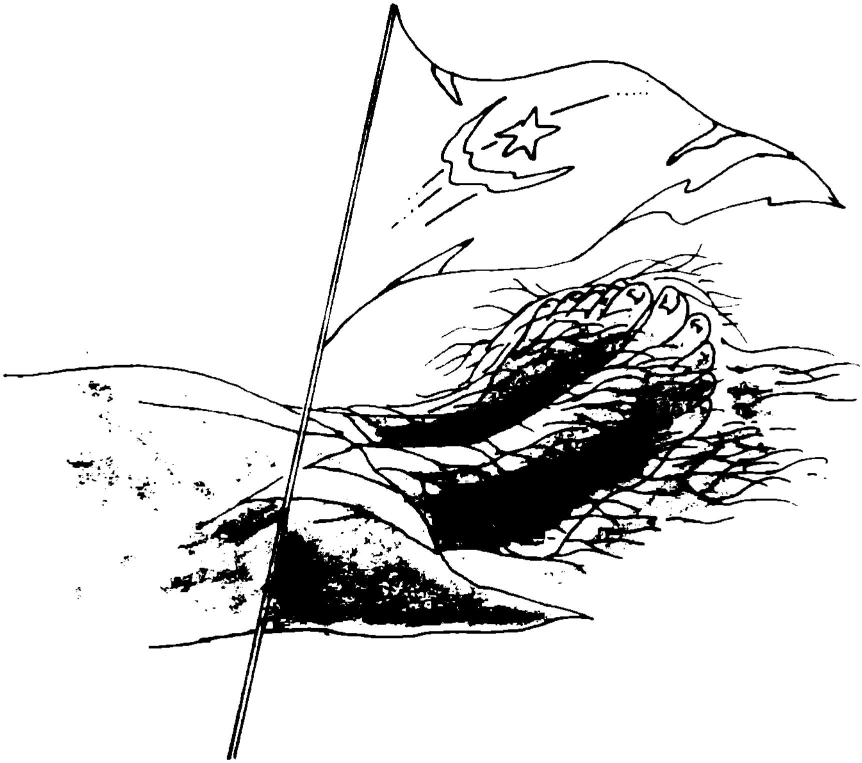

শহীদি কাফেলায় তিনিও শামিল

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)।
রাসূলের (সা) এক মহান সাহাবী।
তিনি ছিলেন একাধারে রাসূলের (সা) একান্ত সাথী এবং বিখ্যাত এক মৌলিক কবি।
তৎকালীন আরবে যে সকল কবি কবিতা চর্চা করতেন তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ছিলেন সর্বজন পরিচিত এবং নন্দিত এক কবি।
ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলের সংস্পর্শে এসে তিনি পেয়ে যান কবিতা লেখার বিশাল ভাণ্ডার।
তাঁর চারপাশে কেবল কবিতার উপাদান এবং উপসর্গ।
তখন তাঁর কবিতাও নদীর স্রোতের মতো বেগবান হয়ে ওঠে।
স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁকে কবিতা লিখতে ও চর্চা করতে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করতেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলের (সা) অনুপ্রেরণা এবং ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) কবিতার ক্ষেত্রে আরও বেশি জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন।

তিনিও রাসূলের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং সকৃতজ্ঞ। যেমন তাঁর 'হিদায়াতের আলো' কবিতায় আমরা সেই আলোকচ্ছটা লক্ষ্য করি। কবিতাটি এরকম–

"আমাদের আছেন আল্লাহর রাসূল :
রাতের আঁধার চিরে যখন
উদিত হয় ঊষা
তখনও তিনি আল্লাহর কিতাব
করেন তিলাওয়াত।

রাত কাটে তাঁর
শয্যা থেকে শরীর আলাদা করে
আল্লাহর দরবারে মিনতি করে
মুশরিকদের যখন আরো ভারী হয়ে আসে ঘুম।

আঁধারের পর নিয়ে এলেন তিনি
হিদায়াতের আলো।
আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি বিশ্বাসে উজ্জ্বল।
যা তিনি বলেন,
অবশ্যই ঘটবে তা একদিন।"

সাবাবী কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) রাসূলের (সা) প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিলো এমনি।

যে কারণে রাসূলও (সা) তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন অত্যন্ত দরদের সাথে। কম কথা নয়, স্বয়ং রাসূলের (সা) কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন শায়িরু রাসূলিল্লাহ বা রাসূলুল্লাহর (সা) কবি উপাধি।

এমন সৌভাগ্যবান কবি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)।

সাহাবী কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) জাহিলি ও ইসলামী উভয় জীবনে অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি তৃতীয় আকাবায় সত্তর জন মদিনাবাসীর সাথে অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন এবং সাদ ইবনুর রাবির সাথে তিনিও

www.nagorikpathagar.org

বনি আল-হারিছার নকিব মনোনীত হন।

ইসলাম গ্রহণের পর মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে কুবায় উপস্থিত হলেন।

তিনি যেদিন কুবা থেকে সর্বপ্রথম মদিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, সাদ ইবনুর রাবি ও খারিজা ইবন যায়িদ তাঁদের গোত্র বনি আল-হারিছার লোকদের সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীর পথ রোধ করে দাঁড়ান এবং তাঁকে তাদের গোত্রের মাঝে অবতরণের বিনীত আবেদন জানান।

হযরত রাসূলে করীম (সা) তাঁদের বলেন, উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশমত চলছে, আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থামবে। তাঁরা তখন পথ ছেড়ে দেন।

সাহাবী কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) কবিতা লিখতেন আবার তিনি জিহাদেও অংশগ্রহণ করতেন।

বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার, উমরাতুল কাদা প্রভৃতি অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

শুধু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাই নয়, তিনি শহীদি তামান্না নিয়ে প্রতিটি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান ইবন হারব ঘোষণা দেয় যে, 'এখন থেকে ঠিক এক বছর পর 'বদর আস-সুগরা'-তে আবার তোমাদের মুখোমুখি হব।'

রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীগণ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরাইশরা অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়।

এই 'বদর আস-সুগরা'-তে রাসূল (সা) বাহিনীসহ আট দিন অপেক্ষা করেন। এটা হিজরি চতুর্থ সনের জিলকদ মাসের কথা।

সাহাবী কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) যে কত বড় একজন সাহসী সত্যের সৈনিক ছিলেন তার দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

কবিতায় যেমন ছিলেন ক্ষুরধার তেমনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে সাহসী তলোয়ার!

তাঁর সাহসের দু'একটি চরণ মাত্র এখানে তুলে ধরা হলো। যেমন–

বদর যুদ্ধের সূচনা পূর্বে কুরাইশ পক্ষের উতবা ইবন রাবিআ তার ভাই শায়বা

www.nagorikpathagar.org

ইবন রাবিআ ও ছেলে আল-ওয়ালিদ ইবন উতবাকে সঙ্গে করে প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়।

তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে আফ, মুয়াওয়াজ ও কবি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সর্বপ্রথম এগিয়ে যান।

উতবা তাঁদের বলল, 'তোমাদের সাথে আমরা লড়তে চাই না।'

বদরের বিজয় বার্তা দিয়ে হযরত রাসূলে করীম (সা) মদিনার চতুর্দিকে লোক পাঠান।

তিনি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে পাঠান মদিনার উঁচু অঞ্চলের দিকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের হাতে বন্দী কুরাইশদের সম্পর্কে সাহাবীদের মতামত জানতে চান।

তাঁদের সম্পর্কে নানাজন নানা মত প্রকাশ করেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ!

প্রচুর জ্বালানি কাঠে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকায় তাদেরকে জড়ো করে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হোক। তারপর আমিই সেই কাঠে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলবো।

খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে করীম (সা) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার রচিত কবিতা বার বার আবৃত্তি করেছিলেন। তার কিছু অংশ এরকম–

"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না
আমরা জাকাত দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না
তুমি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাজিল কর,
যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখ।
যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে,
তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করলে, আমরা তার প্রতিশোধ নেবো।"

কবির কী সৌভাগ্য!

রাসূল (সা) নিজেই তাঁর কবিতা বারবার আবৃত্তি করেছেন এবং সেই কবিতা থেকে যাবতীয় রস-গন্ধ এবং সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন।

পেয়েছেন তিনি হৃদয়ের প্রচুর সুখানুভূতির উপাদান।

এই খন্দক যুদ্ধের সময় মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরায়জার নেতা কাব ইবন আসাদ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সম্পাদিত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

খবরটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছে গেল।

তিনি খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন লোককে কাবের নিকট পাঠান।

তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন!

খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মুজিজা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ঘটনা সিরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

আর তার সাথে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নামটিও উচ্চারিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো–

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ভাগ্নি তথা নুমান ইবন বাশিরের বোন বললেন :

একদিন আমার মা উমরাহ বিনতু রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে কিছু খেজুর বেঁধে দিয়ে বললেন :

এগুলি তোমার বাবা বাশির ও মামা আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে দিয়ে এসো, তাঁরা দুপুরে খাবেন।

আমি সেগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আর আমার পিতা ও মামাকে খোঁজ করছি।

রাসূল (সা) আমাকে দেখে ডাক দিলেন :

এই মেয়ে, এদিকে এসো। তোমার কাছে কী?

বললাম : খেজুর। আমার মা আমার বাবা বাশির ইবন সাদ ও মামা আবদুল্লাহর দুপুরের খাবারের জন্য পাঠিয়েছেন।

রাসূল (সা) বললেন : ওগুলো আমার কাছে দাও।

আমি খেজুরগুলি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই হাতে ঢেলে দিলাম, কিন্তু হাত ভরলো না।

তিনি কাপড় বিছাতে বললেন এবং খেজুরগুলি কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেন।

তারপর পাশের লোকটিকে বললেন : যাও, খন্দকবাসীদের দুপুরের খাবার খেয়ে যেতে বল।

রাসূলের (সা) এই ঘোষণার পর পরই সবাই চলে এলেন এবং খাবার খেতে শুরু করলেন।

তাঁরা খাচ্ছেন, আর খেজুরও বাড়ছে। তাঁরা পেট ভরে খেয়ে চলে গেলেন, আর তখনও কাপড়ের ওপর কিছু খেজুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকলো।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে (রা) খাইবারে উৎপাদিত খেজুর পরিমাপকারী হিসাবে আবারও সেখানে পাঠান।

কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) কঠোরতার

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো।

এক পর্যায়ে তারা ঘুষও দিতে চাইল। ইবন রাওয়াহা তাদেরকে বললেন : ‘হে আল্লাহর দুশমনরা। তোমরা আমাকে হারাম খাওয়াতে চাও? আমার প্রিয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার নিকট তোমরা বানর ও শূকর থেকেও ঘৃণিত। তোমাদের প্রতি ঘৃণা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা তোমাদের ওপর কোন রকম জুলুমের দিকে নিয়ে যাবে না।’

একথা শুনে তারা বলল : এমন ন্যায়পরায়ণতার ওপরই আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সে বছরের মুলতবি উমরাহ রাসূল (সা) পরের বছর হিজরি সপ্তম সনে আদায় করেন।

একে উমরাতুল কাদা বা কাজা উমরা বলে।

এই সফরে রাসূলে করীম (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং উটের পিঠে বসে হাজারে আসাওয়াদ চুম্বন করেন তখন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাঁর বাহনের লাগাম ধরে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির কিছু অংশ এরকম–

“ওরে কাফিরের সন্তানরা!
তোরা তাঁর পথ থেকে সরে যা,
তোরা পথ ছেড়ে দে।
কারণ, সকল সৎকাজ তো তাঁরই সাথে।
আমরা তোদের মেরেছি কুরআনের ব্যাখ্যার ওপর,
যেমন মেরেছি তার নাজিলের ওপর।
এমন মার দিয়েছি যে,
তোদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
বন্ধু ভুলে ফেলে গেছে তার বন্ধুকে।
প্রভু, আমি তাঁর কথার ওপর ঈমান এনেছি।”

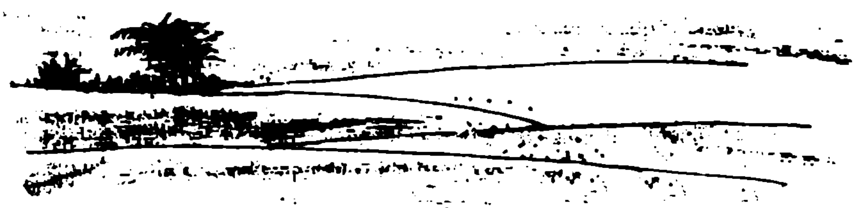

www.nagorikpathagar.org

এক সময় হযরত উমর (রা) ধমক দিয়ে বললেন : আল্লাহর হারামে ও রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এভাবে কবিতা পাঠ?

রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করে বললেন : 'উমর! আমি তাঁর কথা শুনছি।

আল্লাহর কসম! কাফিরদের ওপর তাঁর কথা তীর-বর্শার চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল।'

রাসূল (সা) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে বললেন : 'তুমি এভাবে বল :

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদুহু, নাসারা আবদাহ ওয়া আ'আয্যা জুনদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ'–এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং একাই প্রতিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।'

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উপরোক্ত বাক্যগুলি আবৃত্তি করছিলেন, আর তাঁর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলেন সমবেত মুসলিম জনমণ্ডলী। তখন মক্কার উপত্যকাসমূহে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

হিজরি অষ্টম সনের জামাদি-উল-আউয়াল মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বসরার শাসকের নিকট দূত মারফত একটি চিঠি পাঠান।

পথে মুতা নামক স্থানে এক গাসসানি ব্যক্তির হাতে দূত নিহত হয়। দূতের হত্যা মূলত যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত।

রাসূল (সা) খবর পেয়ে যায়িদ ইবন হারিছার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মুতায় পাঠান।

যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রাসূলে করীম (সা) বললেন : 'যায়িদ হবে এ বাহিনীর প্রধান।

সে নিহত হলে জাফর ইবন আবি তালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে। জাফরের পর হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা।

আর সেও যদি নিহত হয় তাহলে মুসলমানরা আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের আমির বানিয়ে নেবে।'

বাহিনী মদিনা থেকে যাত্রার সময় হযরত রাসূলে করীম (সা) সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাঁদের বিদায় জানান।

বিদায় বেলা মদিনাবাসীরা তাঁদেরকে বললেন : 'তোমরা নিরাপদে থাক এবং সফল হয়ে ফিরে এসো। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাঁদতে লাগলেন।'

লোকেরা বলল : 'কাঁদার কী আছে?'

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, 'দুনিয়ার মুহাব্বতে আমি কাঁদছি না।'
এরপর তিনি সূরা মারইয়াম-এর আয়াত-'তোমাদের প্রত্যেককেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করতে হবে।
এটা তোমার রব-এর অনিবার্য সিদ্ধান্ত-পাঠ করেন।'
তারপর তিনি বলেন, 'আমি কি সেই পুলসিরাত পার হতে পারবো?'
লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল :
'আল্লাহ তোমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবার মিলিত করবেন।'
তখন তিনি স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির কয়েকটি লাইনের ভাবানুবাদ এরকম-

"তবে আমি রহমানের কাছে মাগফিরাত কামনা করি,
আর কামনা করি অসির অন্তরভেদী একটি আঘাত,
অথবা কলিজা ও নাড়িতে পৌঁছে যায় নিজার এমন একটি খোঁচা।

আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যেন বলে-
হায় আল্লাহ, সে কত ভালো যোদ্ধা ও গাজি ছিল!"

মদিনা থেকে শামের 'মা'আন নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন যে, রোমান সম্রাট হিরাকল এক লাখ রোমান সৈন্যসহ 'বালকা'র 'মাব' নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে।
আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে লাখম, জুজাম, কায়ন, বাহরা, বালিসহ বিভিন্ন গোত্রের আরও এক লাখ লোক।
এ খবর পেয়ে তাঁরা মা'আনে দুই দিন ধরে চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করেন।
মুসলিম সৈনিকদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে, আমরা শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও প্রস্তুতির সব খবর রাসূলকে (সা) অবহিত করি।
তারপর তিনি আমাদেরকে অতিরিক্ত সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন এবং আমরা সেই মোতাবেক কাজ করব।
আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তখন সৈনিকদের উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।
তিনি বলেন, 'হে জনমণ্ডলী, এখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হতে পছন্দ করছো না; অথচ তোমরা সবাই শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্য বের হয়েছো।

আমরা তো শত্রুর সাথে সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের দ্বারা লড়বো না। আমরা লড়বো দীনের বলে বলীয়ান হয়ে-যে দীনের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

সম্মানিত করেছেন। তোমরা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমাদের সামনে আছে দুইটি কল্যাণের যে কোন একটি–হয় বিজয়ী হবে নতুবা শাহাদাত লাভ করবে।'

সৈনিকেরা তাঁর কথায় রাজি হয়ে বললেন :

'আল্লাহর কসম! ইবনে রাওয়াহা ঠিক কথাই বলেছেন।' তাঁরা তাঁদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাঁদের সাথে চলেন।

তাঁরা 'মা'আন' ত্যাগ করে মুতায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এখানে অমুসলিমদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ হয়।

ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'মুতার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা মাত্র তিন হাজার আর শত্রুবাহিনীর সংখ্যা অগণিত।

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। সেনাপতি যায়িদ ইবন হারিছা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হলেন।

জাফর তাঁর পতাকাটি তুলে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনিও শাহাদত বরণ করলেন।

এবার আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে তুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার মুহূর্তে তাঁর মনে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দিল। তিনি সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। কবিতাটির কিছু অংশ এরকম–

'হে আমার প্রাণ!
আমি কসম করেছি,
তুমি অবশ্যই নামবে,
তুমি স্বেচ্ছায় নামবে অথবা নামতে বাধ্য করা হবে।
মানুষের চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে,
তোমার কী হয়েছে যে,
এখনও জান্নাতকে অবজ্ঞা করছো?
সেই কত দিন থেকে না এই জান্নাতের প্রত্যাশা করে আসছো,
পুরনো ফুটো মশকের এক বিন্দু পানি ছাড়া তো তুমি আর কিছু নও।
হে আমার প্রাণ,
আজ তুমি নিহত না হলেও একদিন তুমি মরবে,

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুর হাম্মাম এখানে উত্তপ্ত করা হচ্ছে।
যা কামনা করতে এখন তোমাকে তাই দেয়া হয়েছে,
তোমার সঙ্গীদ্বয়ের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে হিদায়াত পাবে।'

রোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। ন তাঁর এক চাচাতো ভাই গোশতসহ এক টুকরো হাড় নিয়ে এসে তা ে দেন।

। সেটা হাতে নিয়ে যেই না একটু চাটা দিয়েছেন, ঠিক তখনই প্রচণ্ড যুদ্ধে াগোল ভেসে এলো।

। এখনও বেঁচে আছ'–এ কথা বলে হাতের হাড়টি ছুঁড়ে ফেলে দি ারি হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

পক্ষের এক সৈনিক এমন জোরে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুসলিম বাহিনী ্য ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

টি তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়।

। রক্তরঞ্জিত অবস্থায় সাথীদের আহবান জানান।

রা ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

www.nagorikpathagar.org

ইতোমধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
মুতায় অবস্থানকালে শাহাদাতের পূর্বে এক রাতে তিনি একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।
আবৃত্তি শুনে যায়িদ ইবন আরকাম কাঁদতে শুরু করেন।

তিনি যায়িদের মাথার ওপর দুররা উঁচু করে ধরে বললেন : 'তোমার কী হয়েছে?
আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করলে তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাবে।'

হযরত রাসূলে করীম (সা) ওহির মাধ্যমে মুতার প্রতি মুহূর্তের খবর লাভ করে মদিনায় উপস্থিত লোকদের সামনে বর্ণনা করছিলেন।
মুতার খবর আসার পূর্বেই রাসূল (সা) মদিনায় যায়িদ, জাফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর দান করেন।
তিনি বললেন : 'যায়িদ ঝান্ডা হাতে নেয় এবং শহীদ হয়। তারপর জাফর সেটা তুলে নেয়, সেও শহীদ হয়।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নেয় এবং সেও শহীদ হয়।'
তিনি একথা বলছিলেন আর তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।
মুতার তিন সেনাপতির মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে এই বলে দুআ করেন :
'আল্লাহ তুমি যায়িদকে ক্ষমা করে দাও।'
একথা তিনবার বলেন, তারপর বলেন : 'আল্লাহ তুমি জাফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে ক্ষমা করে দাও।'
আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার একটি বিখ্যাত কবিতার অংশবিশেষ এমন–
'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ওয়াদা সত্য,
কাফিরদের ঠিকানা দোজখ,
আরশ ছিল পানির ওপর,
আরশের ওপর ছিলেন বিশ্বের প্রতিপালক,
আর সেই আরশ বহন করে তাঁরই শক্তিশালী ফিরিশতারা।
আল্লাহর ফিরিশতারা শ্বেত-শুভ্র চিহ্ন বিশিষ্ট।'

www.nagorikpathagar.org

সামরিক দক্ষতা ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার আরও অনেক যোগ্যতা ছিল।
একারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সমাদর করতেন।
সেই জাহিলি আরবে যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আরবিতে লেখা জানতেন, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাঁদের অন্যতম।
ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় 'কাতিব' হিসাবে নিয়োগ করেন।
কী সৌভাগ্য তাঁর!
তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কবি।
মদিনায় ইসলাম রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করলে আরবের মুশরিকগণ আরও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

মক্কার পৌত্তলিক কবিগণ বিশেষত :
আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবারি, কাব ইবন যুহায়র ও আবু সুফাইন ইবন আল হারিছ রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতো।
তখন মদিনায় হাসসান ইবন ছাবিত, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কাব ইবন মালিক তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়ে সমুচিত জবাব দেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দু'পক্ষের এ কবিতার যুদ্ধ চলতে থাকে।
হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।
তিনি হাসসান ও কাবের সমপর্যায়ের কবি ছিলেন।
জাহিলি যুগে তিনি কবি কায়স ইবনুল খুতায়ম-এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মূলক কবিতা লিখে প্রতিযোগিতা করতেন।
আর ইসলামী যুগে রাসূলের (সা) প্রশংসা এবং মুশরিক কবিদের প্রতিবাদ ও নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন।

একদিন নবী (সা) বললেন :
'যারা তাঁদের অস্ত্রের দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছে, জিহ্বা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে তাদেরকে কিসে বিরত রেখেছে?'
এই কথার পর যে তিনজন কবি পৌত্তলিক কবিদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যান তাঁরা হলেন, হাসসান, কাব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা) মনে করতেন, এই তিনজন কবির কবিতা শত্রুদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তিনি বলেছেন : 'এই তিন কবি কুরায়শদের কাছে তীরের ফলার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।'

কবি হাসসান কুরায়শদের বংশ ও রক্তের ওপর আঘাত হানতেন, কবি কাব কুরায়শদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের দোষ-ক্রটি তুলে ধরতেন।

অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাদের কুফরির জন্য নিন্দা ও ধিক্কার দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন স্বভাব কবি।

উপস্থিত কবিতা রচনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

তাৎক্ষণিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার চেয়ে অধিকতর সক্ষম কবি আর কেউ তখন ছিলেন না।

একদিন তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। পূর্বেই সেখানে হযরত রাসূলে করীম (সা) একদল সাহাবীর সাথে বসে ছিলেন।

তিনি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে কাছে ডেকে বলেন, তুমি এখন মুশরিকদের সম্পর্কে কিছু কবিতা শোনাও। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কিছু কবিতা শোনালেন। তাঁর একটি কবিতা এরকম–

'আল্লাহ্ আপনাকে যে সৌন্দর্য ও শোভা দান করেছেন তা স্থির ও দৃঢ় করুন ।

যেমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন মূসাকে (আ)
এবং বিজয় দান করুন,
যেমন তাঁদেরকে বিজয় দান করেছিলেন।'

কবিতাটি শুনে রাসূল (সা) একটু হাসি দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে অটল রাখুন।

যখন সূরা আশশুআরা-এর ২২৪-২২৬ নং আয়াতগুলো–'কবিদেরকে তারাই অনুসরণ করে যারা বিভ্রান্ত।

তুমি কি দেখনা তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং যা করে না তাই বলে বেড়ায়?'

www.nagorikpathagar.org

নাজিল হয় তখন হাসসান, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কাব এত ভীত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে যান।
তাঁরা বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই আয়াত নাজিলের সময় আল্লাহ তো জানতেন আমরা কবি।

তখন রাসূল (সা) আয়াতের পরবর্তী অংশ–'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে'–পাঠ করেন এবং বলেন, এই হচ্ছো তোমরা।
রাসূলের (সা) মুখ থেকে একথা শোনার পর তাঁরা খুশি এবং আশ্বস্ত হলেন।
আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন একজন দুনিয়া বিরাগী আবেদ ও সব সময় আল্লাহকে স্মরণকারী ব্যক্তি।

তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন, যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, দুই রাকাআত নামাজ আদায় করতেন।
আবার ঘরে ফিরে এসে ঠিক একই রকম করতেন। এ ব্যাপারে কখনও অলসতা করতেন না।
একবার এক সফরে এত প্রচণ্ড গরম ছিল যে, মানুষ সূর্যের তেজ থেকে বাঁচার জন্য নিজ নিজ মাথার ওপর হাত দিয়ে রেখেছিল। এমন গরমে কে রোজা রাখে?
কিন্তু তার মধ্যেও কেবল হযরত রাসূলে করীম (সা) ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সাওম পালন করেন।

জিহাদের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। বদর থেকে নিয়ে মুতা পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে তার একটিতেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সবার আগে যুদ্ধে বের হতেন এবং সবার শেষে ঘরে ফিরতেন।

সাহাবী কবি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিলো কোরবানি, ত্যাগ, ঈমান, আনুগত্যসহ বহু বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্টসমূহের কারণে রাসূল (সা) তাঁর প্রশংসায় বলেছেন :

'নিমার রাজুলু আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা–আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কতই না ভালো মানুষ ছিলেন!'

www.nagorikpathagar.org

সাহাবী কবি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কবিতার ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন খ্যাতিমান তেমনি জিহাদের ময়দানেও ছিলেন অসাধারণ এক সাহসের ফুলকি। কবি হয়েও তাঁর মধ্যে ছিলো শাহাদাতের এক অদম্য পিপাসা।

রাব্বুল আলামিন যেমন তাঁর কবিতাকে কবুল করেছেন ঠিক তেমনি তাঁর সেই শাহাদাতের স্বপ্নও পূরণ করেছেন।

এজন্যইতো তিনি হাজার বছর পরেও আমাদের মাঝে উল্লেখিত হচ্ছেন স্বগৌরবে।
বোধ করি এভাবেই শহীদ কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলের (সা) অনুসারীদের মাঝে উচ্চারিত হতে থাকবেন। #

www.nagorikpathagar.org

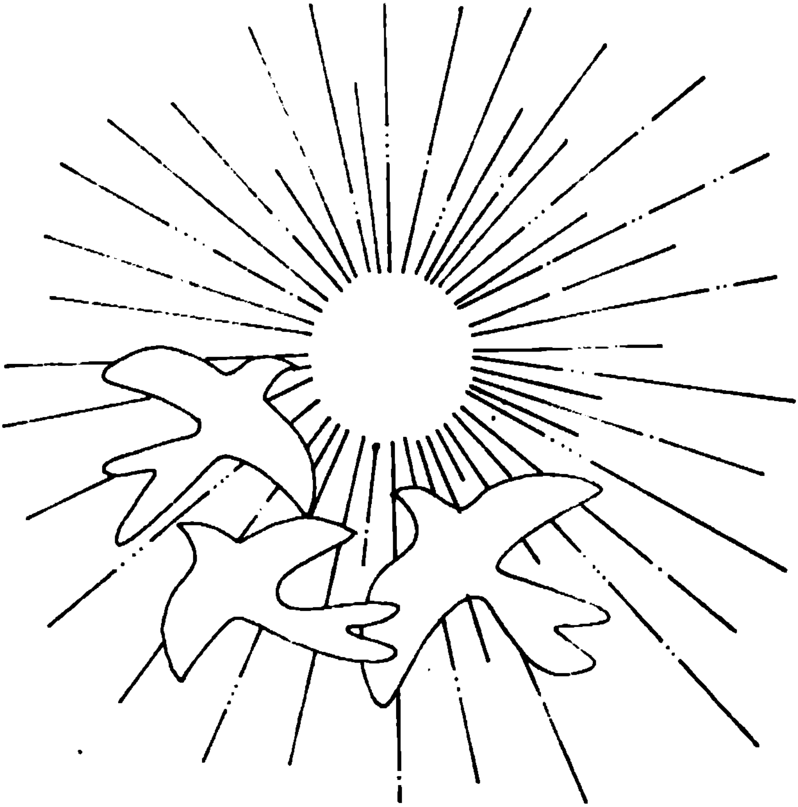

বিজয় হাসে নীলাকাশে

তাঁকে মনে হয় হেমন্তের আকাশ।

ঠিক হেমন্তের মতই তাঁর হৃদয়ের চাতাল।

যেমনই কোমল, তেমনই সাহসী।

নাম তাঁর যায়িদ ইবনুল খাত্তাব।

মদিনায় আসার পর হযরত যায়িদ সর্বপ্রথম 'বদর' যুদ্ধে শরিক হন। তারপর উহুদেও অংশগ্রহণ করেন।

দারুণ সাহসী ছিলেন তিনি।

প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি যতটা না বিজয় কামনা করতেন তারচেয়ে বেশি কামনা করতেন শাহাদাতের।

সেকি হৃদয়ের ব্যাকুল আকুলতা!

উহুদে তিনি অসীম সাহসের সাথে লড়ছেন।

www.nagorikpathagar.org

এমন সময় তাঁর ভাই উমার লক্ষ করলেন যায়িদের বর্মটি খুলে পড়ে গেছে এবং সে দিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি খোলা শরীরে শত্রু বাহিনীর মাঝখানে ঢুকে পড়ছেন।

উমার ভাইকে খুব ভালোবাসতেন।

তিনি চিৎকার করে ভাইকে ডেকে বললেন,

যায়িদ! এই নাও আমার বর্মটি। এটি পরে যুদ্ধ কর।

হযরত যায়িদ উত্তর দিলেন,

হে উমার! আমার প্রাণপ্রিয় ভাই–তোমার মত আমারও যে শাহাদাতের সুমধুর পানীয় পান করার আকাঙ্ক্ষা আছে!

তারপর দু'জনই বর্ম ছাড়াই যুদ্ধ করেন।

হযরত যায়িদ হুদাইবিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাছাড়া খন্দক, হুনাইন, আওতাস প্রভৃতি যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হজেও তিনি রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন।

এ সফরেই তিনি রাসূলের (সা) এই বাণী শোনেন,

"তোমরা যা নিজেরা খাও, পর, তাই তোমাদের দাস-দাসীদের খাওয়াও, পরাও। যদি তারা কোন অপরাধ করে, আর তোমরা তা ক্ষমা করতে না পার, তাহলে তাকে বিক্রি করে দাও।"

হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহীদের যে ফিতনা বা অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা নির্মূলের জন্য হযরত যায়িদ অন্যদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

বিখ্যাত মুরতাদ নাহার ইবন উনফুহ্–যার ইসলাম ত্যাগ করা সম্পর্কে রাসূলের (সা) তার মুসলমান থাকাকালেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাকে হযরত যায়িদ নিজ হাতে হত্যা করেন।

মুসাইলামা কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে ইসলামী ঝাণ্ডা বহনের দায়িত্ব পড়ে যায়িদের ওপর।

যুদ্ধ চলাকালে বনু হানিফা একবার এমন মারাত্মক আক্রমণ চালায় যে, মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

কিছু সৈনিক তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এতে যায়িদের সাহস আরও বেড়ে যায়। তিনি চিৎকার করে সাথীদের আহ্বান জানিয়ে বলতে লাগলেন,

"হে জনমণ্ডলী, তোমরা দাঁত কামড়ে ধরে শত্রুর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

www.nagorikpathagar.org

তোমরা সুদৃঢ় থাক। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ তাদের পরাজিত না করা অথবা আমি আল্লাহর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলবো না। আল্লাহর সাথে মিলিত হলে সেখানেই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলবো।"

তারপর তিনি সঙ্গী-সাথীদের ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলতে থাকেন,

"হে আল্লাহ, আমার সঙ্গী-সাথীদের ভেগে যাওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।"

এ অবস্থায় তিনি পতাকা দুলিয়ে শত্রু বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে চলে যান এবং তরবারি চালাতে চালাতেই এক সময় শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর শাহাদাতের পর হযরত সালেম (রা) পতাকা হাতে তুলে নেন।

হযরত যায়িদ ছিলেন হযরত উমারের (রা) অতি প্রিয়জন। তাঁর মৃত্যুতে হযরত উমার অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে কোন মুসিবত উপস্থিত হলেই তিনি বলতেন,

"যায়িদের মৃত্যুশোক আমি পেয়েছি এবং সবর করেছি।"

যায়িদের হত্যাকারীকে দেখে উমার (রা) বলেন,

"তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছো। প্রভাতের পূবালী বায়ু তারই স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।"

এত প্রিয় ভায়ের মৃত্যুশোকে হযরত উমার কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়েননি। বরং মদিনায় খলিফা আবু বকরের (রা) সাথে তিনি ইয়ামামা প্রত্যাগত সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। তাদের কাছে ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে তিনি বলে ওঠেন,

"দু'টি নেক কাজে তিনি আমার থেকে অগ্রগামী রয়ে গেলেন–আমার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমার আগে শাহাদাতও বরণ করলেন।"

এই হলো হযরত যায়িদের সাহস ও ত্যাগের মহিমা!

যিনি এইভাবে নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারেন, তিনিই তো জয় করতে পারেন আখিরাত।

বিজয়ের হাসি কেবল তাঁর জন্য। অসীম নীল আকাশও এই ধরনের সাহসীর জন্য হেসে ওঠে বিজয়ের হাসি।

প্রকৃত সাহসীর পুরস্কার ও চূড়ান্ত বিজয় তো এমনই হয়।

www.nagorikpathagar.org

পানির ধারে ন্যায়ের পথিক

ধবধবে নিটোল নীলাকাশ।
তারায় তারায় ভরপুর আকাশের বুক।
জোসনার আলোক ধারা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।
মরু-প্রান্তর, জনপদ–সবই কেমন ফকফকে সাদা।
মক্কার অলিতে-গলিতে কেবলই গুঞ্জন–
কে এনেছেন, কে এনেছেন এমনই আলোক ধারা?
সবার মধ্যে কৌতূহল। সবার মধ্যে জিজ্ঞাসার বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।

www.nagorikpathagar.org

তিনি তো আর কেউ নন—প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা)।

তাঁর পাশেই যত নক্ষত্রের ভিড়। তাঁর দিকেই দলে দলে ছুটে আসছে সত্য পিপাসু পথিক।

তেমনই একজন সত্যের পিপাসু আবু মাসউদ আল বদরি (রা)।

আবু মাসউদ ডাক নাম, আর এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম উকবা এবং পিতার নাম আমর ইবন সা'লাবা। সর্বশেষ বাইয়াতে আকাবায় যোগ দিয়ে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

উহুদ এবং উহুদ-পরবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন।

তিনি বদরে যোগ দেন এবং এ কারণেই তাঁকে বদরি বলা হয়।

নবুওয়াতের যুগ ও প্রথম তিন খলিফার সময় পর্যন্ত আবু মাসউদ মদিনায় ছিলেন। জীবনের কোন এক পর্যায়ে কিছু দিনের জন্য বদরের পানির ধারে বসবাস করেছিলেন। হযরত আলীর খিলাফতকালে মদিনা ছেড়ে কুফায় চলে যান এবং সেখানে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন।

তিনি ছিলেন হযরত আলীর (রা) একান্ত সহচর। আলীর (রা) সময়ে তিনি কুফায় যান এবং আলী (রা) সিফফিনে যাওয়ার সময় তাঁকে কুফার আমিরের দায়িত্ব দিয়ে যান।

হযরত আবু মাসউদের এক পুত্র ও এক কন্যার পরিচয় জানা যায়। পুত্রের নাম বাশির এবং কন্যা ছিলেন হযরত ইমাম হাসানের (রা) স্ত্রী। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত যায়িদ ইবন হাসান। বাশিরের জন্ম হয় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বা তার কিছু পরে।

হযরত আবু মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদিসের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করেন। হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীদের তৃতীয় তবকা বা স্তরে তাঁকে গণ্য করা হয়। হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত একশো দুইটি হাদিস পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনাচারের অনুসরণ এবং সত্যের প্রচার ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-নিষেধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে পালন করতেন। একবার তিনি তাঁর এক দাসকে মারছেন। এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ ভেসে এলো :

আবু মাসউদ! একটু ভেবে দেখ। যে আল্লাহ তোমাকে তার ওপর ক্ষমতাবান

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, তিনি তাকেও তোমার ওপর ক্ষমতাবান করতে পারতেন।

আওয়াজটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা)। আবু মাসউদ ভীষণ প্রভাবিত হন। সেই মুহূর্তে তিনি শপথ করেন, আগামীতে কোন দিন আর কোন দাসের গায়ে হাত তুলবেন না। আর সেই দাসটিকে তিনি মুক্ত করে দেন।

সত্যের দায়িত্ব পালন থেকেও তিনি কক্ষনো উদাসীন ছিলেন না। আর এ ব্যাপারে ছোট-বড় কারো পরোয়া করতেন না।

হযরত মুগিরা ইবন শুবা (রা) তখন কুফার আমির একদিন তিনি একটু দেরিতে আসরের নামাজ পড়ালেন। সাথে সাথে আবু মাসউদ প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন :

আপনার জানা আছে, রাসূল (সা) পাঁচ ওয়াকত নামাজ জিবরিলের বর্ণনা মত সময়ে আদায় করতেন, আর বলতেন : এভাবেই আমাকে নির্দেশ দেওয়া তিনি নিজে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করতেন। একদিন তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন,

তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে নামাজ আদায় করতেন?

তারপর তিনি নামাজ আদায় করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন।

নামাজের জামায়াতে গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো রাসূলের (সা) সুন্নাত। তিনি যখন দেখলেন, লোকেরা তা পুরোপুরি পালন করছে না, তখন বলতেন : এমনভাবে দাঁড়ানোর ফায়দা এ ছিলো যে, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। এখন তোমরা দূরে দূরে দাঁড়াও, এ জন্যেই তো বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত আবু মাসউদ প্রকৃত অর্থে ছিলেন একজন সত্যের সৈনিক।

ছিলেন রাসূলের (সা) পূর্ণ অনুসারী।

সাহস ছিলো তাঁর একান্ত ভূষণ। যুদ্ধের ময়দানে দেখা যেত তাঁর সেই সাহসের ফুলকি।

ইমানের দীপ্তিতে ভাস্বর ছিলেন তিনি। অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তারপরও জ্ঞানতৃষ্ণা মিটতো না তাঁর। এজন্য সকল সময় ছায়ার মত রাসূলের (সা) কাছেই ছুটে যেতেন। যেমন ছুটেছেন তিনি সত্যের পথে আজীবন পানির ধারে এই ন্যায়ের পথিক।

এজন্যই তো তিনি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন চূড়ান্ত সফলতার আকাশ।

আমরাও পারি বটে তেমনটি, যদি সত্য ও সাহসের পথে সর্বদা চলমান থাকি।

www.nagorikpathagar.org

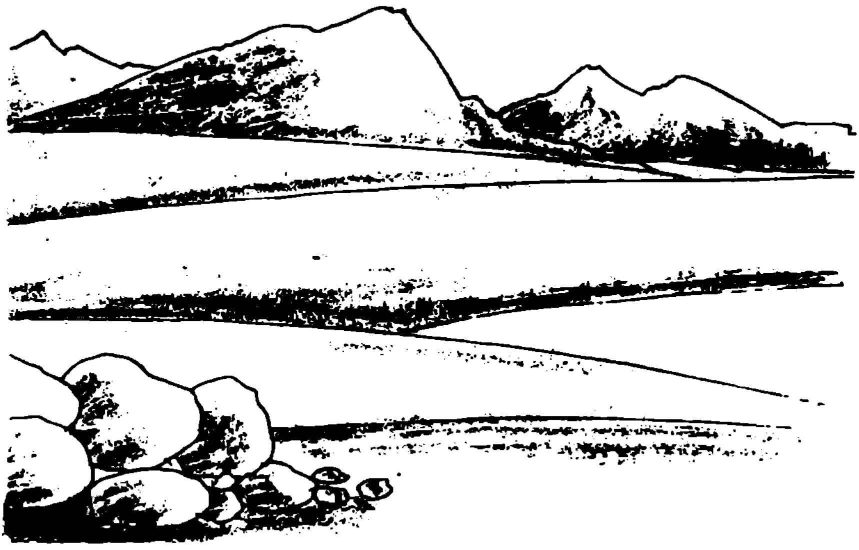

ভালোবাসার বিশাল আকাশ

আমাদের রাসূল (সা)।–
প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা) ছিলেন একেবারেই এতিম।
এতিম ছিলেন বলেই তিনি বুঝতেন এতিম ও অসহায়দের মনের কষ্ট। জীবনের কষ্ট। কাজের কষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

তাদের সকল কষ্টই তিনি অনুভব করতেন একান্ত হৃদয় দিয়ে।
ফলে তাদের সেইসব কষ্টের তুষার দূর করার জন্য রাসূল (সা) সকল সময় থাকতেন ব্যাকুল।
তাদের প্রতি ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়।
আকাশের মতো, তার চেয়েও বিশাল।
বিশাল ছিলো তাঁর মন ও ভালোবাসার দরিয়া। সেখান থেকে উঠে আসতো দরদের তুফান। মমতার ঢেউ।

সেই ঢেউ আছড়ে পড়তো নবীর (সা) চারপাশে। সকলের হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে যেত রাসূলের (সা) ভালোবাসার কোমল তুষারে।
মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা–সেতো এক মহৎ গুণ।
মানুষকে ভালোবাসতেন রাসূল (সা) মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, জীবন দিয়ে।
কিন্তু এতিম, গরিব, দুস্থ এবং অসহায়দের প্রতি রাসূলের (সা) ছিল ভালোবাসার মাত্রাটা অনেক অনেক গুণে বেশি।
যার কোনো তুলনাই হয় না।
সেই ভালোবাসার নজির তো রয়ে গেছে রাসূলের (সা) জীবনেই।
তাঁর জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায়। লাইনে লাইনে। অক্ষরে অক্ষরে।
সে সবই আমাদের জন্য হীরকসমান। আলোকসমান।
তা যেমন শিক্ষণীয় তেমনই পালনীয়।
এতো আমাদের সকলেরই জানা। তবুও আর একবার স্মরণ করি সেই এক ঈদের কথা!

ঈদ মানেই তো খুশি আর খুশি। আনন্দের ঢল।
সবার জন্যই চাই ঈদের আনন্দ। সমান খুশি। কিন্তু চাইলেই কি সব হয়? কিছু ব্যতিক্রম তো থেকেই যায়।
যেমন রাসূলের (সা) সময়ে এক ঈদে, নামাজ শেষে ঘরে ফিরছেন দয়ার নবীজী (সা)। তিনি দেখলেন মাঠের এক কোণে বসে কাঁদছে একটি অবুঝ শিশু।
এই খুশির দিনেও কান্না! অবাক হলেন রাসূল (সা)।
রাসূল (সা) ছেলেটির কাছে গিয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।
শিশুটি বললো, আমার আব্বা-আম্মা নেই। কেউ আমাকে আদর করে না। কেউ আমাকে ভালোবাসে না। আমি কোথায় যাবো?

www.nagorikpathagar.org

এতিম নবী রাহ্মাতুল্লিল আলামিন।–
ছেলেটির কথা শুনে গুমরে কেঁদে উঠলো নবীজীর (সা) কোমল হৃদয়। জেগে উঠলো তাঁর মর্মবেদনা। তিনি পরম আদরে শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন।
হযরত আয়েশাকে (রা) ডেকে বললেন,
হে আয়েশা! ঈদের দিনে তোমার জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছি। ছেলেটিকে পেয়ে দারুণ খুশি হলেন হযরত আয়েশা (রা)। দেরি না করে মুহূর্তেই তাকে গোসল করিয়ে জামা পরালেন। তারপর তাকে পেট ভরে খেতে দিলেন।

রাসূল (সা) ছেলেটিকে বললেন, আজ থেকে আমরাই তোমার পিতা-মাতা। আমরাই তোমার অভিভাবক। কি, খুশি তো!
রাসূলের (সা) কথা শুনে ছেলেটির চোখেমুখে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা।
এই ছিল এতিমদের প্রতি রাসূলের (সা) ভালোবাসার বিরল দৃষ্টান্ত।
রাসূল (সা) শুধু এতিমদের প্রতিই যে এমন সদয় ছিলেন, সহমর্মী ছিলেন তাই নয়–তিনি তাঁর অধীনস্থদের প্রতিও ছিলেন সদা সজাগ।
মায়া এবং মমতার চাদরে তাদেরকে আঁকড়ে রাখতেন।
তাদের যেন কোনো কষ্ট না হয়, মনে যেন কোনোপ্রকার দুঃখ না থাকে–দয়ার নবী (সা) সেদিকে খেয়াল রাখতেন সর্বক্ষণ।
রাসূলের (সা) দু'জন খাদেম বা চাকর ছিলেন। একজন হযরত জায়েদ ও আর একজন হযরত আনাস (রা)।

তাদের সাথে রাসূল (সা) কখনোই মনিবসুলভ আচরণ করতেন না।
কড়া ভাষায় কথা বলতেন না।
খারাপ ব্যবহার করতেন না।
মেজাজ দেখাতেন না।
আদেশ কিংবা নির্দেশে কঠোরতাও দেখাতেন না।
বরং আপন পরিবারের সদস্যদের মতই তাদের সাথে ব্যবহার করতেন।
একই খাবার খেতেন।
একই ধরনের জীবন-যাপন করতেন।
কী আশ্চর্যের ব্যাপার!
আজকের দিনে যা কল্পনাও করা যায় না।
হযরত যায়েদের (রা) কথাই বলি না কেন!

www.nagorikpathagar.org

ছোট্ট বেলায় তিনি মা-বাপ থেকে হারিয়ে যান।

আল্লাহর রহমতে তার আশ্রয় হয় রাসূলের (সা) ঘরে।

যখন তার পিতা-মাতার সন্ধান পাওয়া গেল, তখন তারা ছুটে এলো রাসূলের (সা) কাছে।

তারা তাকে নিয়ে যেতে চায়।

রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার পিতা-মাতার সাথে যাবে?

যায়েদ (রা) সাথে সাথেই বললেন, রাসূলের (সা) কাছ থেকে যে ব্যবহার আমি পেয়েছি, তাঁর কোনো তুলনা হয় না। তামাম পৃথিবী যদি আমাকে দেয়া হয় তবুও তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।

হযরত আনাস (রা)।

তিনি আট বছর বয়সে রাসূলের (সা) খেদমতে এসেছিলেন।

দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত রাসূলের (সা) খেদমত করেছিলেন।

সেই হযরত আনাস (রা) বলেন,

দীর্ঘ দশ বছর রাসূলের (সা) খেদমত করেছি। কিন্তু এই দশ বছরের মধ্যে কোন একটি দিনও রাসূল (সা) আমাকে একটি কথাও ধমক দিয়ে বলেননি।

এমনই ছিল রাসূলের (সা) আচার-ব্যবহার।

এমনই ছিল তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা।

এমনই ছিল তাঁর উদারতা। ছিল দয়া ও মমতার অসীম সাগর। কিংবা সাগরের চেয়েও অধিক।

রাসূলের (সা) একজন প্রকৃত অনুসারীর মতো এমনই হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে আমাদের।

যে হৃদয় হবে ভালোবাসায় পূর্ণ। মমতায় টইটম্বুর।

যে হৃদয় হবে আকাশের চেয়েও প্রশস্ত। সাগরের চেয়েও বিশাল।

এমনই হৃদয় তৈরির জন্য প্রয়োজন রাসূলের (সা) শিক্ষা ও সৎ সাহসের।

এজন্যই আমাদের রাসূলের (সা) আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

তাঁর পথেই চলতে হবে।

তাঁর শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে।

তাহলেই কেবল সার্থক ও সফল হবে আমাদের জীবন। #

www.nagorikpathagar.org

সেই এক মানুষ সাগর সমান

দুই বন্ধু। গলায় গলায় মিল তাদের।

যেমন তাদের মনের মিল, তেমনই আত্মার।

বন্ধুর মতই বন্ধু।

সমান দরদি।

সমান দায়িত্বশীল।

এমন বন্ধুর জুটি খুব বেশি দেখা যায় না।

এক বন্ধুর নাম আবুল হায়সাম।

ওপর বন্ধু আসয়াদ ইবন যুরারা।

একবার বন্ধু আসয়াদ ইবন যুরারা ও জাকওয়ান ইবন আবদু কায়েস মক্কায় উতবা ইবন রাবিয়ার নিকট যান।

সেখানে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতের কথা শুনতে পেয়ে গোপনে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আসয়াদ মদিনায় ফিরে আবুল হায়সামের সাথে দেখা করেন এবং নিজে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দাওয়াতের কথা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন।

ইবন সাদ বলেন, ইয়াসরিবে পূর্ব থেকেই–সেই জাহিলি যুগে আসয়াদ ও আবুল হায়সাম ছিলেন তাওহিদ বা একত্ববাদের প্রবক্তা। আবুল হায়সাম বন্ধু যুরারার মুখে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দাওয়াতের কথা শুনে কোন রকম দ্বিধা–সংকোচ না করে সাথে সাথে বলে ওঠেন :

'আনা আশহাদু মা'য়াকা আন্নাহু রাসূলুল্লাহ'–আমিও তোমার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল। এভাবে তিনি তাঁর বন্ধু যুরারার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় আকাবার শপথের সময় মদিনাবাসীরা যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) মদিনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো তখন মক্কা ও মদিনাবাসীদের পক্ষ থেকে যে কয়েকজন লোক ভাষণ দেন, আবুল হায়সাম ছিলেন তাদের অন্যতম।

আবুল হায়সাম ইবন তায়্যিহান রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করার সময় বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সাথে অন্য লোকদের চুক্তি আছে। এমনও কি হতে পারে, আমরা সেই চুক্তি বাতিল করলাম, তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, আর এদিকে আপনি স্বগোত্রে ফিরে এলেন? তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) একটু হাসি দিয়ে বললেন :

তোমাদের রক্তের দাবির অর্থ হবে আমারই রক্তের দাবি। তোমাদের রক্তপাত মানে আমারই রক্তপাত। অর্থাৎ আমার ও তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

রাসূলুল্লাহর (সা) একথায় সন্তুষ্ট হয়ে আবুল হায়সাম সাথীদের লক্ষ করে বলেন : "আমার স্বগোত্রীয় লোকেরা! এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী। আজ তিনি মক্কার হারামে আত্মীয়দের মধ্যে নিরাপদেই আছেন। জেনে রাখ, যদি তোমরা এখান থেকে বের করে তাঁকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও তাহলে সমগ্র আরববাসী একই ধনুক থেকে তোমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ সকলের সাধারণ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি বিলিয়ে দিতে রাজি থাক তাহলেই তাঁকে তোমাদের ভূমিতে আমন্ত্রণ জানাও। কারণ,

www.nagorikpathagar.org

তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। তোমরা যদি পরে অনুশোচনার ভয় কর তাহলে ভেবে দেখ।"

আবুল হায়সামের এ বক্তব্যের পর তাঁর সাথীরা বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু আমাদের দিয়েছেন, আমরা তা কবুল করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের নিকট যা কিছু দাবি করেছেন আমরা তা আপনাকে দান করলাম। আবুল হায়সাম, আপনি একটু সরে দাঁড়ান, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করি।

আবুল হায়সাম বললেন : আমিই প্রথম বাইয়াত করি। তাঁর বাইয়াতের পর অন্যরা একের পর এক বাইয়াত করে।

এই বাইয়াতের পর রাসূলে কারীম (সা) বারোজন নকিব বা দায়িত্বশীলের নাম ঘোষণা করেন। আউস গোত্র থেকে আবুল হায়সাম, উসাইদ ইবন হুদাইর ও সা'দ ইবন খায়সামা–এই তিনজন নকিব মনোনীত হন।

রাসূলে কারীম (সা) মদিনায় হিজরাত করে প্রখ্যাত মুহাজির হযরত উসমান ইবন মাজউনের সাথে আবুল হায়সামের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দেন।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে হায়সাম যোগ দেন। উহুদে তাঁর ভাই আতিক ইবন তায়্যিহান ইকরিমা ইবন আবু জেহালের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

কিন্তু নির্ভীক ও দুঃসাহসী হায়সাম।

তিনি ভাইয়ের শাহাদাতেও এতটুকু ভেঙে পড়লেন না।

বরং দ্বিগুণ সাহসে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন!

একেই বলে তরতাজা ঈমান।

ঈমানের সাহস!

আল হায়সাম ইবন নাসর আলআসলামি (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমত করেছি। আবুল হায়সাম ইবন তায়্যিহানের জাসিম নামক একটি কুয়ো ছিল।

এই কুয়োর পানি ছিল অত্যন্ত সুমিষ্ট। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এই কুয়ো থেকে পানি আনতাম।

একবার গরমের দিনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু বকরকে (রা) সঙ্গে করে আবুল হায়সামের বাড়িতে আসেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন : ঠাণ্ডা

www.nagorikpathagar.org

পানি আছে কি?

আবুল হায়সাম এক বালতি বরফের মত ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসেন। ছাগলের দুধের সাথে সেই ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) পান করান। তারপর আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি ঠাণ্ডা ছাউনি আছে। এই দুপুরে আপনি সেখানে একটু বিশ্রাম নিন। আবুল হায়সাম ছাউনির ওপর পানি ছিটিয়ে দেন। রাসূল (সা) আবু বকরকে সঙ্গে করে সেখানে প্রবেশ করেন। আবুল হায়সাম বিভিন্ন ধরনের খেজুর এবং ডিশ ভর্তি সারিদ বা সুস্বাদু পানীয় তাঁদের সামনে হাজির করেন।

রাসূল (সা), আবু বকর এবং আমরা সবাই তা আহার ও পান করলাম। তারপর নামাজের সময় হলে তিনি আবুল হায়সামের বাড়িতে আমাদের নিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় করেন। জামায়াতে আবুল হায়সামের স্ত্রী ছিলেন আমার পেছনে। নামাজ শেষে তিনি আবার ছাউনিতে ফিরে যান এবং সেখানে জোহরের ফরজের পরের দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করেন।

একদিন রাসূলে কারীম (সা) অভ্যাসের বিপরীত, যখন তিনি ঘর থেকে বের হন না এমন এক সময়ে বের হলেন।

কিছুক্ষণ পর আবু বকরও আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, এমন অসময়ে বের হলে যে? বললেন, আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে।

এর মধ্যে উমরও সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকেও ঠিক একই প্রশ্ন করলেন। উমর জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ক্ষুধাই আমাকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

রাসূল (সা) বললেন : আমিও ক্ষুধার্ত।

রাসূল (সা)সহ তিনজন একসাথে আবুল হায়সামের বাড়িতে গেলেন। তাঁর ছিল খেজুরের বাগান এবং বকরির পাল। কিন্তু কোন চাকর-বাকর ছিল না। সব কাজ নিজে করতেন। আর তখন তিনি বাড়িতেও ছিলেন না। আওয়াজ দিলে তাঁর স্ত্রী বললেন, পানি আনতে গেছেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি মশক ভর্তি পানি নিয়ে ফিরছেন।

রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখে মশক মাটিতে রেখে দেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলতে থাকেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কোরবান হোক! তারপর সবাইকে বসিয়ে রেখে খেজুরের একটি কাঁদি কেটে নিয়ে আসেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা) বললেন : যদি পাকা খেজুর নিয়ে আসতে!

হায়সাম বললেন : এতে কাঁচা-পাকা সব রকমের আছে। আপনার খুশিমত গ্রহণ করুন।

রাসূল (সা) সেই খেজুর থেকে কিছু খেলেন। তারপর পানি পান করলেন। সেই পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। রাসূল (সা) পানাহারের পর বললেন, দেখ, আল্লাহ্‌র কত নিয়ামত। ছায়া, উৎকৃষ্ট খেজুর, ঠাণ্ডা পানি–আল্লাহ্‌র কসম, কিয়ামতের দিন এর সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আবুল হায়সাম সম্মানিত মেহমানদের বাগানে বসিয়ে রেখে বাড়িতে আসেন এবং খাবারের আয়োজন করেন। তিনি ছোট একটি ছাগল জবেহ করেন এবং ভুনা করে মেহমানদের সামনে হাজির করেন।

আহার পর্ব শেষ করে রাসূল (সা) বললেন : আমার হাতে কোন যুদ্ধবন্দি এলে তুমি আমার কাছে এস।

সেই সময় রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাতে দু'জন যুদ্ধবন্দি আসে। তিনি আবুল হায়সামকে তাদের যে কোনো একজনকে গ্রহণ করতে বলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) ওপর নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেন। রাসূল (সা) তাদের একজনকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেনঃ এর সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

তিনি দাসটিসহ বাড়িতে এসে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) উপদেশের কথা স্ত্রীর নিকট বলেন।

স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি সব শুনে বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আদেশ-পালন করতে চাও, তাহলে তাকে আজাদ করে দাও।

আবুল হায়সাম স্ত্রীর পরামর্শ মত দাসটি আজাদ করে দেন। তাঁদের এ কাজের কথা রাসূল (সা) জানতে পেরে খুব খুশি হলেন এবং তাদের দু'জনেরই প্রশংসা করলেন।

আবুল হায়সাম ছিলেন যেমনই সাহসী তেমনই উদার।

সেই এক মানুষ সাগর সমান!

তাঁর হৃদয়ের চাতাল ছিলো বিরাট-বিশাল। আর সত্যের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

ঈমানই ছিল তাঁর এই সকল গুণের আধার।

এমন নক্ষত্রের তুলনা কোথায়!

স্বপ্ন জাগে, আহ! আমরাও যদি তেমনই হতে পারতাম।

বড় সাধ জাগে, বড় লোভ লাগে তাঁর মত ঈমানের বলে বলীয়ান হবার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

সাহস যেন বাউরি বাতাস

সৌভাগ্যবানরা এমনই হন।
তাঁদের জন্য খুলে যায় একের পর এক আলো ঝলমল দরজা।
বিশ্বাস, সাহস, সততা ও কঠিন প্রত্যয়ের মাধ্যমেই তাঁরা জয় করেন জীবনকে।
ঠিক তেমনই এক সফল সাহসী সৈনিক হযরত সাদ (রা)।
প্রথম আকাবায় যখন ছয়জন ইয়াসরিববাসী মক্কায় রাসূলুল্লাহর হাতে (সা)

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণ করে বাইয়াত করেন তাঁদের একজন ছিলেন হযরত সাদ (রা)। সেই ছয় ব্যক্তি হলেন : ১. আসয়াদ ইবন যুরারা ২. আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান ৩. আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ৪. সাদ ইবনুর রাবি ৫. আন-নুমান ইবন হারিসা ও ৬. উবাদা ইবনুস সামিত।
হযরত রাসূলে করীম (সা) কুবা থেকে মদিনায় উপস্থিত হলেন।
মদিনার সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়।

রাসূল (সা) বিভিন্ন গোত্রের ভেতর দিয়ে চলছিলেন, আর সেই গোত্রের লোকেরা তাঁর বাহনের পথ রোধ করে তাদের কাছে নামার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল। যখন তিনি বনু আল-হারিস ইবনুল খাযরাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সাদ ইবনুর রাবি খারিজা ইবন যায়িদ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বনি হারিসার আরও কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাওয়ারির সামনে এসে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সংখ্যা, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষার দিকে আসুন। আপনাকে সম্মানের সাথে আশ্রয় দানের মত-ক্ষমতা আমাদের আছে। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমার বাহনের পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত।

তাঁরা সবাই পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন।
রাসূলুল্লাহ (সা) সাদ ইবনুর রাবি ও আবদুর রহমান ইবন আউফের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। হযরত সাদ তাঁর এই মুহাজির ভাইয়ের প্রতি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখান দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। সে এক বিরল দৃষ্টান্ত।
হযরত সাদ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ করেন অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে।
উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে একদল প্রতিপক্ষ যোদ্ধা পরাস্ত করে হত্যা করে নির্মমভাবে।
তাঁর দেহে তীর-বর্শার মোট বারোটা আঘাত লাগে। তিনি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছেন তখন মালিক ইবন দুখশান তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন,

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদ নাকি নিহত হয়েছেন, তুমি জান?
সাদ জবাব দেন, তিনি নিহত হলেও আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তুমি তোমার দীনের পক্ষে জিহাদ কর। মুহাম্মাদ তো তাঁর রবের বাণী ও দীনের বিধি-বিধান পৌঁছানোর দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করে গেছেন।
উহুদের যুদ্ধ শেষে হযরত রাসূলে করীম (সা) বললেন,
কেউ সাদ ইবনুর রাবির খোঁজ নিয়ে এসোতো!

এক ব্যক্তি বললেন, আমি যাচ্ছি। লোকটি উহুদের প্রান্তরে পড়ে থাকা লাশগুলির চারপাশে চক্কর দিয়ে সাদের নাম ধরে জোরে ডাক দিলেন।
কোন সাড়া পাওয়া গেল না।
কিন্তু যখন তিনি এই কথা চিৎকার করে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার খোঁজে আমাকে পাঠিয়েছেন।
তখন ক্ষীণ কণ্ঠের একটা আওয়াজ ভেসে এল–
আমি মৃতদের মধ্যে আছি।
তখন তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত ! শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জিহ্বাও আয়ত্তে নেই।

লোকটি যখন তাঁর খোঁজে ঘোরাঘুরি করছে, তখন সাদই তাঁকে ডাক দেন।
সেই অবস্থায় সাদ তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) আমার সালাম পৌঁছিয়ে বলবেন, আমাকে বারোটি আঘাত করা হয়েছে। আমিও আমার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। আর আনসারদের বলবেন, যদি দুর্ভাগ্যবশত রাসূল (সা) নিহত হন, আর তোমাদের একজনও জীবিত ফিরে যাও, আল্লাহকে মুখ দেখানোর যোগ্য তোমরা থাকবে না। কারণ, 'লাইলাতুল আকাবায়' (আকাবার রাত্রি) তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিলে।
তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সাদের পবিত্র রূহ তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

শহীদ হলেন হযরত সাদ!
শহীদ হলেন এক দুঃসাহসী সত্যের সৈনিক। যিনি কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন নি। কারোর কাছে মাথাও নত করেন নি।
সাদের শাহাদাতের পর তার ভাই জাহিলি প্রথা অনুসারে তাঁর সকল সম্পত্তি দখল করে নেয়। সাদ গর্ভবতী স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান রেখে যান। তখনও

www.nagorikpathagar.org

মিরাসের (উত্তরাধিকার) আয়াত নাজিল হয়নি।

সাদের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী একদিন তাঁর দুই কন্যাকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা সাদের কন্যা। ওদের পিতা উহুদে শাহাদাত বরণ করেছেন। আর ওদের চাচা সকল সহায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বসেছে, ওদেরকে কিছুই দেয়নি। অর্থ-সম্পদ ছাড়া ওদের বিয়ে শাদি হবে কেমন করে?

রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তায়ালা ওদের ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন। এর পরই সূরা আন নিসার ১১নং আয়াতের এই অংশটুকু নাজিল হয়–

'যদি কন্যা কেবল দুই-এর অধিক হয় তাহলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ।'

উপরোক্ত আয়াত নাজিলের পর হযরত রাসূলে করীম (সা) মেয়ে দু'টির চাচাকে ডেকে নির্দেশ দেন, সাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তার দুই-মেয়েকে, এক–অষ্টমাংশ তাদের মাকে দেওয়ার পর বাকিটা তুমি গ্রহণ কর।

হযরত সাদের ঈমানী সাহস ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছিল আকাবার বাইয়াত, উহুদের যুদ্ধ এবং শাহাদাতের পূর্বে করে যাওয়া অসিয়াতের মধ্যে।

এইসব কারণে সাহাবায়ে কিরামের নিকট হযরত সাদের একটা বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তাঁর এক কন্যা একবার হযরত আবু বকরের (রা) নিকট আসলে তিনি তাঁর বসার জন্য নিজের কাপড় বিছিয়ে দেন। তা দেখে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করেন,

মেয়েটি কার?

খলিফা বললেন, এ সেই ব্যক্তির মেয়ে–যিনি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন।

আবার প্রশ্ন করলেন, এমন মর্যাদা কি জন্য?

বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় জান্নাতে পৌঁছে গেছেন আর তুমি ও আমি এখনও এখানে পড়ে আছি।

এক ব্যক্তি খলিফা আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি সাদ ইবনুর রাবির ছোট্ট একটি মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার লালা মুছে দিচ্ছেন ও চুমু

www.nagorikpathagar.org

খাচ্ছেন।
লোকটি জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি কে?
তিনি জবাব দিলেন, এ এমন এক ব্যক্তির মেয়ে যিনি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম। এ সাদ ইবনুর রাবির মেয়ে। তিনি ছিলেন আকাবার নকিব, বদরের যোদ্ধা ও উহুদের শহীদ।

এই হলেন হযরত সাদ (রা)।
যিনি ছিলেন সত্যের জন্য উদার আকাশ আর মিথ্যার প্রতিপক্ষে ছিলেন বৈশাখী তাণ্ডব, প্রচণ্ড ঘূর্ণি, বাউরি বাতাস।
এমনই সফল আলোকিত জীবন লোভনীয় এবং একান্ত কাম্য।
সুতরাং আর দেরি কেন!
এসো গড়ি তেমনই জীবন।

www.nagorikpathagar.org

সনাপতির নির্দেশ

ন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

ারপাশ তখন ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে।

ঠিক এমনই সময়।–

মনই সময় হযরত হুজাইফার পিতা আল-ইয়ামান মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

মক্কায়, ইসলামের প্রথম পর্বে।

পিতার সাথে মা-ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

কী এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

পুলকিত ও শিহরিত আকাশ-বাতাস।

ভাগ্যবান হুজাইফা!

তিনি ক্রমশ বেড়ে ওঠেন মুসলিম পিতা-মাতার কোলে।

আরও মজার ব্যাপার যে হযরত রাসূলে করীমকে (সা) দেখার সৌভাগ্য অর্জনের আগেই তিনি মুসলিম হন।

ভাই-বোনের মধ্যে শুধু তিনি ও সাফওয়ান এ গৌরবের অধিকারী হন।

মুসলিম হওয়ার পর রাসূলকে (সা) একটু দেখার আগ্রহ জন্মে তার।

দারুণ আগ্রহ!

দিন দিন তার মধ্যে এ আগ্রহ তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হতে থাকে।

তিনি সব সময় যারা রাসূলকে (সা) দেখেছেন, তাঁদের কাছে রাসূলের (সা) চেহারা-সুরত ও গুণ-বৈশিষ্ট্য কেমন তা জানার জন্য প্রশ্ন করতেন।

শেষে তিনি একদিন সত্যি সত্যি মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হন এবং হিজরত ও নুসরাতের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান।

রাসূল (সা) তাঁকে দু'টোর যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেন।

হুজাইফা বলেন : রাসূল (সা) হিজরাত ও নুসরাত (মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অবস্থান)-এর যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা আমাকে দান করেন।

আমি পরম আনন্দের সাথে নুসরাতকে বেছে নিলাম।

মক্কার প্রথম সাক্ষাতে তিনি প্রশ্ন করেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মুহাজির না আনসার?

রাসূল (সা) জবাব দিলেন : তুমি মুহাজির বা আনসার যে কোন একটি বেছে নিতে পার।

তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আনসারই হবো।

হযরত হুজাইফা উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে যোগদান করেন।

পিতা ও পুত্র একই সাথে যুদ্ধ করছেন!

হুজাইফা দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করেন এবং নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন।

কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ সাহসী পিতা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন! আর সে

www.nagorikpathagar.org

শাহাদাত ছিল স্বপক্ষীয় মুসলিম সৈনিকদের হাতে। ঘটনাটি ছিল একটু অন্যরকম। যেমন–

উহুদ যুদ্ধের আগে নারী ও শিশুদের একটি নিরাপদ দুর্গে রাখা হয়। আর এ দুই বৃদ্ধকে রাখা হয় ঐ দুর্গের তত্ত্বাবধানে।

যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করলো, তখন আল–ইয়াসান তার সাথী সাবিতকে বললেন :

তোমার বাপ নিপাত যাক! আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? পিপাসিত গাধার স্বল্পায়ুর মত আমাদের সবার আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। আমরা খুব বেশি হলে আজ অথবা কাল পর্যন্ত বেঁচে আছি। আমাদের কি উচিত নয়, তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট চলে যাওয়া? হতে পারে, আল্লাহ তাঁর নবীর (সা) সাথে আমাদের শাহাদাত দান করবেন।

তখন তাঁরা দু'জন তরবারি হাতে নিয়ে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে যুদ্ধের এক পর্যায়ে পৌত্তলিক বাহিনী পরাজয় বরণ করে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল।

তখন এক দুরাচারী শয়তান চেঁচিয়ে বলে ওঠে,

দেখ দেখ, মুসলমানরা এসে পড়েছে!

একথা শুনেই পৌত্তলিক বাহিনীর একটি দল ফিরে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের একটি দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

আল–ইয়ামান ও সাবিত দু'দলের তুমুল সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান।

পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে সাবিত শাহাদাত বরণ করেন।

কিন্তু হুজাইফার পিতা আল-ইয়ামান শহীদ হন মুসলমানদের হাতে।

না চেনার কারণে এবং যুদ্ধের ঘোরে এমনটি ঘটে যায়।

হুজাইফা কিছু দূর থেকে পিতার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠেন :

'আমার আব্বা, আমার আব্বা' বলে।

কিন্তু সে চিৎকার কারো কানে পৌঁছেনি।

যুদ্ধের শোরগোলে তা অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়।

ইতোমধ্যে বৃদ্ধ নিজ সঙ্গীদের তরবারির আঘাতে ঢলে পড়ে গেছেন।

হুজাইফা পিতার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শুধু একটি কথা উচ্চারণ করেন :

'আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।'

কী অসাধারণ ধৈর্য ও সাহস!

www.nagorikpathagar.org

কী অসম্ভব মনের জোর!
ঈমানী শিক্ষার কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত!
হযরত রাসূলে করীম (সা) হুজাইফাকে তাঁর পিতার দিয়াত বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি বললেন :
আমার আব্বা তো শাহাদাতেরই প্রত্যাশী ছিলেন।
তিনি সেটা লাভ করেছেন। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক, আমি তাঁর দিয়াত বা রক্তমূল্য মুসলমানদের জন্য দান করে দিলাম।
হুজাইফার এই সাহসী উচ্চারণে রাসূল (সা) দারুণ খুশি হলেন।
হযরত হুজাইফা খন্দক যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
যুদ্ধের ময়দানে কুরাইশরা এমন তোড়জোড় করে ধেয়ে আসে যে, মদিনায় ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে।
মদিনার চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত কুরাইশ বাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে গেছে।
রাসূল (সা) আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, আর সেইসাথে মদিনার প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক খনন করেন।

একদিন রাতে এক অভিনব ঘটনা ঘটে গেল!
সেটা ছিল মুসলমানদের জন্য এক অদৃশ্য সাহায্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে।
কুরাইশরা মদিনার আশপাশের বাগানগুলিতে শিবির স্থাপন করে আছে।
হঠাৎ প্রচণ্ড এমন এক বাতাস বইতে শুরু করলো যে, কুরাইশদের তাঁবু রশি ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।
হাঁড়ি–পাতিল উল্টে-পাল্টে গেল।
এবং হাড় কাঁপানো শীত শুরু হলো।
কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বললো,
আর উপায় নেই! এখনই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে।
জলদি পালাতে হবে।
আর দেরি নয়। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়!
হযরত রাসূলে করীম (সা) কুরাইশ বাহিনী নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন।
তিনি সেই ভয়াল দুর্যোগময় রাতে হুজাইফার শক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন।
আর এ দুঃসাহসী অভিযানের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত হুজাইফাকে নির্বাচন করলেন।
রাসূল (সা) সঙ্গীদের বললেন : 'যদি কেউ মুশরিকদের খবর নিয়ে আসতে

www.nagorikpathagar.org

পারে, তাকে আমি কিয়ামতের দিন আমার সাহচর্যের খোশ খবর দিচ্ছি।'

একে তো দারুণ শীত, তার ওপর প্রবল বাতাস!

কেউ সাহস পেল না।

রাসূল (সা) তিনবার হুজাইফার নাম ধরে ডেকে বললেন :

তুমি যাও, খবর নিয়ে এসো।

যেহেতু নাম ধরে ডেকেছেন, সুতরাং আদেশ পালন ছাড়া হুজাইফার আর কোনো উপায় ছিল না।

এ সম্পর্কে হুজাইফা নিজেই বলেন :

আমরা সে রাতে কাতারবন্দি হয়ে বসেছিলাম।

আবু সুফিয়ান ও মক্কার মুশরিক বাহিনী ছিল আমাদের ওপরের দিকে, আর নিচে ছিল বনি কুরাইজার ইহুদি গোত্র।

আমাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে আমরা ছিলাম শঙ্কিত। আর সেইসাথে ছিল প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঘোর অন্ধকার।

এমন দুর্যোগপূর্ণ রাত আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। বাতাসের শব্দ ছিল বাজ পড়ার শব্দের মত তীব্র।

আর এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল যে, আমরা আমাদের নিজের আঙুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এদিকে মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা একজন একজন করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলতে লাগলো :

আমাদের ঘর-দোর শত্রুর সামনে একেবারেই খোলা। তাই একটু ঘরে ফেরার অনুমিত চাই।

মূলত অবস্থা সে রকম ছিল না। কেউ যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেই রাসূল (সা) অনুমতি দিচ্ছিলেন।

এভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমরা তিন শো বা তার কাছাকাছি সংখ্যক লোক থাকলাম।

এমন এক সময় রাসূল (সা) এক এক করে আমাদের সবার কাছে আসতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছেও আসলেন।

শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার গায়ে একটি চাদর ছাড়া আর কিছু ছিল না। চারদটি ছিল আমার স্ত্রীর, আর তা খুব টেনেটুনে হাঁটু পর্যন্ত পড়ছিল।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা) আমার একেবারে কাছে আসলেন।
আমি মাটিতে বসে ছিলাম।
রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন :

এই তুমি কে?
বললাম : আমি হুজাইফা।
তুমি হুজাইফা? এই বলে রাসূল (সা) মাটির দিকে একটু ঝুঁকলেন, যাতে আমি তীব্র ক্ষুধা ও শীতের মধ্যে উঠে না দাঁড়াই।
আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি হুজাইফা।
তিনি বললেন : তুমি কুরাইশদের শিবিরে যেয়ে আমাকে তাদের খবর এনে দেবে।
আমি বের হলাম।
সেনাপতির নির্দেশ বলে কথা!
অথচ আমি ছিলাম সবার চেয়ে ভিতু ও শীতকাতর।
রাসূল (সা) দু'আ করলেন : হে আল্লাহ!
সামনে-পেছনে, ডানে-বামে, ওপর-নিচে, সব দিক থেকে তুমি তাকে হিফাজত কর।
রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'আ শেষ না হতেই আমার মনের সকল ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। এবং কী আশ্চর্য! শীতের জড়তাও কেটে গেল।
আমি যখন পেছন ফিরে চলতে শুরু করেছি তখন রাসূল (সা) আমাকে আবার ডেকে বললেন :

হুজাইফা! আমার কাছে ফিরে না এসে আক্রমণ করবে না।
বললাম : ঠিক আছে।
আমি রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলতে লাগলাম।
এক সময় চুপিসারে কুরাইশদের শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন আমি তাদেরই একজন।
আমার পৌঁছার কিছুক্ষণ পর আবু সুফিয়ান কুরাইশ বাহিনীর সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বললেন : হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তা মুহাম্মাদের কাছে পৌঁছে যায় কিনা। তোমরা প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখ।
একথা শোনার সাথে সাথে আমার পাশের লোকটির হাত মুট করে ধরে

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞেস করলাম :
কে তুমি?
সে জবাব দিল, আমি অমুকের ছেলে অমুক।
আবু সুফিয়ান বললেন : হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা কোন নিরাপদ গৃহে নও। আমাদের ঘোড়াগুলি মরে গেছে, উটগুলি কমে গেছে এবং মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজাও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাদের যে খবর আমাদের কাছে এসেছে তা সুখকর নয়। আর কেমন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছি, তাও তোমরা দেখছো। আমাদের হাঁড়িও আর নিরাপদ নয়। আগুনও জ্বলছে না। সুতরাং ফিরে চলো। আমি চলছি।
একথা বলে তিনি উটের রশি খুললেন এবং তার পিঠে চড়ে বসে উটের গায়ে আঘাত করলেন।

উট চলতে শুরু করলো। কোন কিছু ঘটাতে রাসূল (সা) যদি নিষেধ না করতেন তাহলে একটি মাত্র তীর মেরে তাকে হত্যা করতে পারতাম।
আমি ফিরে এলাম। এসে দেখলাম রাসূল (সা) তাঁর এক স্ত্রীর চাদর গায়ে জড়িয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন। নামাজ শেষ করে তিনি আমাকে তাঁর দু'পায়ের কাছে টেনে নিয়ে চাদরের এক কোনা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি সব খবর তাঁকে জানালাম।
তিনি দারুণ খুশি হলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পেশ করলেন।
হযরত হুজাইফা সে দিন বাকি রাতটুকু রাসূলুল্লাহর (সা) সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে সেখানেই দেন। প্রত্যুষে রাসূল (সা) তাঁকে ডাকেন :
ইয়া নাওমান-হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!
কী সৌভাগ্যবান হযরত হুজাইফা!
এখানেই শেষ নয়।
আরো আছে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা। অনেক প্রসঙ্গ।
সেখানেও রয়ে গেছে হুজাইফার সাহসের অজস্র সাম্পান।
সে সম্পর্কেও আমরা জানবো আগামীতে।
জানতে হবে আমাদের বড় হবার জন্য।
সাহসী হবার জন্য।
নিজেদের গড়ে ওঠার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

দরিয়া

ওয়া!
য়ে যাচ্ছে প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে।
কজন সাহসী যোদ্ধা।
একেকটি পাথরের দুর্গ।

হিদ।
া এমনই হয়!
ার প্রথম যুদ্ধ বদর।

সী সৈনিক!
র সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
তার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বারবার বিস্ময়ে

www.nagorikpathagar.org

কেমন ছিল সেই দিনটি!
বদর সম্পর্কে তিনি বলছেন :
বদরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গিয়েছিল।
একবার নয়, তিন তিনবার।
আর এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

'স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন।'
উল্লেখ্য যে, বদর যুদ্ধের ময়দানে এক সময় ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।
এতে তাঁদের ক্লান্তি ও ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়।
উহুদ যুদ্ধে আবু তালহা আল্লাহর নবীর জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ন স্থাপন করেন।
এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন তীরন্দাজ বাহিনীর সদস্য।
প্রচণ্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে দূরে ছিটকে পড়ে।
তখন আবু তালহাসহ মুষ্টিমেয় কিছু সৈনিক নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন।
এদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিজের পেছনে আড়াল করে রেখে শত্রুদের দিকে তীর ছুড়ছিলেন।
একটি তীর ছুড়লে রাসূল (সা) একটু মাথা উঁচু করে দেখছিলেন, তা কোথায় গিয়ে পড়ছে।
আবু তালহা রাসূলুল্লাহর বুকে হাতে দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ!
বসুন!
এভাবে থাকুন। তাহলে আপনার গায়ে কোন তীর লাগবে না।
তিনি একটু মাথা উঁচু করলেই আবু তালহা খুব দ্রুত তাঁকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছিলেন।
সেদিন তিনি রাসূলকে (সা) আরও বলেছিলেন,
আমার এ বুক আপনার বুকের সামনেই থাকবে।
এক পর্যায়ে তিনি রাসূলকে (সা) বললেন :

www.nagorikpathagar.org

আমি শক্তিশালী সাহসী মানুষ।
আপনার যা প্রয়োজন আমাকেই বলুন।
তিনি শত্রুদের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুড়ছিলেন আর গুণ গুণ করে কবিতার একটি পঙক্তি আওড়াচ্ছিলেন :

'আমার জীবন হোক আপনার জীবনের প্রতি উৎসর্গ, আমার মুখমণ্ডল হোক আপনার মুখমণ্ডলের ঢাল।'
আবু তালহা ছিলেন একজন শক্তিশালী বীর পুরুষ।
উহুদ যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে করতেই দুই-তিনখানি ধনুক ভেঙে ছিলেন।
কি সাংঘাতিক ব্যাপার!
আক্রমণের প্রচণ্ডতায় তাঁর হাত দু'খানি অবশ হয়ে পড়ছিল। তবুও তিনি একবারও একটু উহ্ শব্দ উচ্চারণ করেননি। কারণ, তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হিফাজত ও নিরাপত্তা।
হযরত আবু তালহা খাইবার যুদ্ধে যোগদান করেন।
এই যুদ্ধের সময় তাঁর ও রাসূলুল্লাহ (সা) উভয়ের উট খুবই নিকটে পাশাপাশি ছিল এবং রাসূল (সা) গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করার জন্য ঘোষক হিসাবে তাঁকেই মনোনীত করেন।
এটাও একটি সৌভাগ্য বটে আবু তালহার জন্য।
এই অভিযান থেকে ফেরার সময় হযরত রাসূলে করীম (সা) ও হযরত সাফিয়্যা ছিলেন এক উটের ওপর।
মদিনার কাছাকাছি এসে উটটি হোঁচট খায় এবং আরোহীদ্বয় ছিটকে মাটিতে পড়ে যান।
আবু তালহা দ্রুত নিজের উট থেকে লাফিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আল্লাহ আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন!
আপনি কি কষ্ট পেয়েছেন?
রাসূল (সা) বললেন :
না। তবে মহিলার খবর নাও।
আবু তালহা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে হযরত সাফিয়্যার নিকটে যান এবং উটের হাওদা ঠিক করে আবার তাঁকে বসিয়ে দেন।
হুনাইন যুদ্ধেও তিনি দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করেন।

www.nagorikpathagar.org

এই যুদ্ধে তিনি একাই বিশ-একুশজন কাফিরকে হত্যা করেন।
রাসূল (সা) ঘোষণা করেছিলেন, কেউ কোন কাফিরকে হত্যা করলে সে হবে নিহত ব্যক্তির সকল জিনিসের মালিক।
এ দিন আবু তালহা একুশ ব্যক্তির সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী হন।
হিজরি অষ্টম সনে সংঘটিত এই যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ।
এই যুদ্ধের সময় আবু তালহা হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মু সুলাইমের হাতে একটি খঞ্জর, আপনি কী তা দেখেছেন?
রাসূল (সা) বললেন, উম্মু সুলাইম, এই খঞ্জর দিয়ে কী করবে? বললেন :
মুশরিকরা কেউ আমার নিকটে এলে এটা দিয়ে তাঁর পেট ফেঁড়ে ফেলবো।
একথা শুনে রাসূল (সা) হাসতে লাগলেন।
বিদায় হজে আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন।
হযরত রাসূলে করীমের ইনতিকালের কাছাকাছি সময় মদিনায় সাধারণত দুই ব্যক্তি কবর খুঁড়তেন। মুহাজিরদের মধ্যে আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ। তিনি খুঁড়তেন মক্কাবাসীদের মত। আর আনসারদের মধ্যে আবু তালহা। তিনি খুঁড়তেন মদিনাবাসীদের মত।
হযরত রাসূলে করীমের (সা) ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে নববীতে বসে দাফন–কাফনের বিষয় পরামর্শ শুরু করলেন।
প্রশ্ন দেখা দিল, কে এবং কোন পদ্ধতিতে কবর তৈরি করবে?
উপরোক্ত দুই ব্যক্তি তখন এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না।
হযরত আব্বাস (রা) একই সময়ে দুইজনের নিকট লোক পাঠালেন তাঁদেরকে ডেকে আনার জন্য। সিদ্ধান্ত হলো, এই দুইজনের মধ্যে যিনি আগে পৌঁছবেন তিনিই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।
তাঁদের ডাকার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়ে হযরত আব্বাস (রা)সহ উপস্থিত সাহাবীরা দু'আ করতে লাগলেন :

হে আল্লাহ, আপনার নবীর জন্য এই দুই জনের একজনকে নির্বাচন করুন।
কিছুক্ষণের মধ্যে যে ব্যক্তি আবু তালহার খোঁজে গিয়েছিল, তাঁকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। অতঃপর আবু তালহা মদিনাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) কবর তৈরি করেন।

www.nagorikpathagar.org

এটাও তার জন্য একটি সৌভাগ্য বটে।
হযরত রাসূলে করীমের ওফাতের পর বহু সাহাবী মদিনা ছেড়ে শামে আবাসন গড়ে তোলেন। আবু তালহাও সেখানকার অধিবাসীদের একজন।
তবে যখনই কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পিষ্ট হতেন, তখনই মাসাধিক কালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মাজারে হাজির হতেন এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন।
হযরত রাসূলে করীমের (সা) প্রতি যে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল, খুব ছোট ছোট ব্যাপারেও তা প্রকাশ পেত। তাঁর বাড়িতে কোন জিনিস এলে তার কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়িতেও পাঠিয়ে দিতেন।

যখন সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত—'তোমরা কোন কল্যাণই লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন সব জিনিস (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর যা তোমাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়'—নাজিল হলো তখন আনসারদের যার কাছে যে সব মূল্যবান জিনিস ছিল সবই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেল এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিল।
আবু তালহা রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর 'বিরাহ' নামক ভূ-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিলেন।
এখানে তাঁর একটি কুয়ো ছিল।
কুয়োটির পানি ছিল সুস্বাদু।
রাসূল এর পানি খুব পছন্দ করতেন।
আবু তালহার এই দানে রাসূল (সা) খুব বেশি খুশি হয়েছিলেন।
একদিন আবু তালহা তাঁর একটি বাগিচার দেয়ালের পাশে নামাজে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এমন সময় একটি ছোট্ট পাখি—এদিক ওদিক উড়ে বেরোনোর পথ খুঁজতে থাকে।
কিন্তু ঘন খেজুর গাছের জন্য বেরোনোর পথ পেল না।
আবু তালহা নামাজে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এই অবস্থা দেখলেন।
এদিকে নামাজ কত রাকায়াত পড়েছেন তা আর স্মরণ করতে পারলেন না।
ভাবলেন এই সম্পদই আমাকে বিপর্যয়ে ফেলেছে।
নামাজ শেষ করে তিনি ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ!

www.nagorikpathagar.org

এ সবই আমি দান করে দিলাম। এই সম্পদ আপনি আল্লাহ্‌র পথে কাজে লাগান।
রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : এই সম্পদ তোমার নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। নির্দেশমত তিনি যাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেন তাঁদের মধ্যে হাসসান ইবন সাবিত ও উবাই ইবন কাবও ছিলেন।
একবার এক ব্যক্তি মদিনায় এলো, সেখানে থাকা-খাওয়ার কোন সংস্থান তার ছিল না। রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন,
যে এই লোকটিকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তার ওপর সদয় হবেন।

আবু তালহা সাথে সাথে বললেন :
আমিই নিয়ে যাচ্ছি।
বাড়িতে ছোট ছেলে-মেয়েদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত কোন খাবার ছিল না।
আবু তালহা স্ত্রীকে বললেন : এক কাজ কর, তুমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াও। তারপর মেহমানের সামনে খাবার হাজির করে কোন এক ছুতোয় আলো নিভিয়ে দাও। অন্ধকারে আমরা খাওয়ার ভান করে শুধু মুখ নাড়াচাড়া করবো, আর মেহমান একাই পেট ভরে খেয়ে নেবে।

যেই কথা সেই কাজ।
স্বামী-স্ত্রী মেহমানকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করালেন, কিন্তু ছেলে-মেয়ে সহ নিজেরা উপোস থাকলেন।
সকালে আবু তালহা আসলেন রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিকট।
তিনি 'তাদের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দান করে'–এই আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শোনান। তারপর আবু তালহাকে বলেন,

অতিথির সাথে তোমাদের রাতের আচরণ আল্লাহ্‌র খুব পছন্দ হয়েছে।
নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল আবু তালহার বিশেষ গুণ।
খ্যাতি ও প্রদর্শনী থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন।
'বিরাহা' সম্পত্তি দান করার সময় তিনি কসম খেয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, একথা যদি গোপন রাখতে সক্ষম হতাম তাহলে কক্ষনো প্রকাশ করতাম না।

www.nagorikpathagar.org

এমনই ছিলেন রাসূলের (সা) একান্ত সাহাবী হযরত আবু তালহা (রা)।
তিনি ছিলেন সততা ও বিশ্বস্ততায় অন্যতম।
ছিলেন ইমান ও সাহসে বলীয়ান।
উদার ছিল তার বিশাল হৃদয়।
হৃদয় তো নয়, যেন এক অসীম দরিয়া!
যে সাগরের দুর্বার ঢেউ এখনও কম্পন তুলে যায় আকাশে-বাতাসে।
আবু তালহার মত এমনই এক সফল জীবন কার না প্রত্যাশার বিষয়?
কার জন্য না লোভনীয়?

বস্তুত, আমরাও হতে চাই তেমনই সাহসী ও সততায় পরিপূর্ণ।
গড়ে তুলতে চাই প্রকৃত সফল জীবন।
সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
আল্লাহর দীনের জন্য।
রাসূলের (সা) ভালোবাসার জন্য।
আল্লাহপাক তেমন জীবনই আমাদেরকে গড়ে তোলার সুযোগ দান করুন।

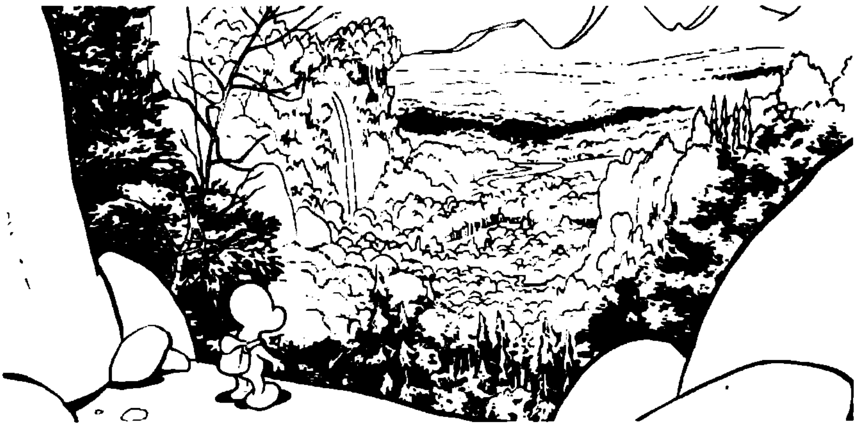

www.nagorikpathagar.org

।গুনের পাহাড়

' চমৎকার আকাশ!
' ধবধবে জোসনার প্লাবন!
।হলে কি জেগে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ!
।, চাঁদইতো বটে!
।ই এক সময় বটে!
' সময়ের আবর্তে দুলে উঠছে কেবলই কোমল হৃদয়।
ধুই কি কোমল?
, যে হৃদয় কোমল এবং কঠিনে ভরপুর।
হস এবং ত্যাগে টইটম্বুর।
মনি একটি নাম উবাদা ইবনুস সামিত (রা)।
বাদার জীবনটি ছিল প্রাণরসে পদ্মপুকুর।
কে বলে একেবারেই টলমলে ভরপুর।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণ করে তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসেই সর্বপ্রথম মা-কে ইসলামে দীক্ষিত করেন।
মদিনায় কাব ইবন আজরা নামে তাঁর ছিল এক অন্তরঙ্গ বন্ধু।
তখনও সে অমুসলিম এবং তার বাড়িতে ছিল বিরাট এক মূর্তি।
উবাদার সব সময়ের চিন্তা ছিল কিভাবে এ বাড়িটি শিরক থেকে মুক্ত করা যায়!
একদিন সুযোগমত সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে তিনি মূর্তিটি ভেঙে ফেলেন।
অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে যান কাব।
বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে উবাদা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন।
প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি লড়ে গেছেন সাহসের সাথে।
কী ভীষণ সেই সাহস!
যেন বারুদের ফুলকি!
বদর যুদ্ধের পর গনিমতের মাল-এর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মুজাহিদদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।
তখন সূরা আনফালের প্রথম থেকে কতগুলি আয়াত নাজিল হয় এবং এ ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সূরা আনফালের উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে উবাদাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন, আয়াতগুলি আমাদের বদরি যোদ্ধাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বদরের দিন আমরা আনফাল-এর ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করি এবং তা নিয়ে যখন আমাদের চাহিদার অবনতি ঘটে তখন আল্লাহ আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন।
তিনি আমাদের মধ্যে সেই মাল সমানভাবে বন্টন করে দেন।

এই বদর যুদ্ধের সময়ই মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ইঙ্গিতে মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
তাদের সাথে উবাদার গোত্র বনি আউফের বহু আগে থেকেই মৈত্রী চুক্তি ছিল।
তেমনিভাবে চুক্তি ছিল মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুলেরও।
তাদের বিদ্রোহের কারণে হযরত রাসূলে করীম (সা) যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তখন উবাদা ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে।
রাসূলকে (সা) তাদের সাথে চুক্তি বাতিলের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বললেন :
আমি তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ও দায়মুক্তির ঘোষণা করছি। আর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদেরকে আমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছি।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুল তার পূর্ব অবস্থায় অটল থাকে। বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বহিষ্কারের এই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব উবাদার ওপর অর্পণ করেন।

কী বিস্ময়কর পুরস্কার!

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা মায়িদার ৫১ নং আয়াত থেকে ৫৮ নং আয়াত পর্যন্ত নাজিল হয়। আয়াতগুলিতে স্পষ্টত উবাদার প্রশংসা ও মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের নিন্দা করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফতকালে শামে যে সকল অভিযান পরিচালিত হয় তার বেশ ক'টিতে উবাদা অংশগ্রহণ করেন।

হযরত উমর ফারুকের খিলাফতকালে আমর ইবন আস মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম না হয়ে মদিনায় খলিফার নিকট অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পাঠান।

খলিফা উমর (রা) চার হাজার মতান্তরে দশ হাজার সৈন্যের একটি অতিরিক্ত বাহিনী পাঠান। উবাদা ছিলেন সেই বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈন্যের কমান্ডিং অফিসার।

খলিফা আমর ইবনুল আসকে একটি চিঠিতে আরও লেখেন–

এই অফিসারদের প্রত্যেকেই এক হাজার সৈন্যের সমান।

এই অতিরিক্ত বাহিনী মিসর পৌঁছার পর আমর ইবনুল আস সকল সৈন্য একত্র করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন।

ভাষণ শেষ করে তিনি উবাদাকে ডেকে বলেন,

আপনার নিযাটি আমার হাতে দিন।

তিনি নিযাটি নিয়ে নিজের মাথার পাগড়িটি খুলে নিযার মাথায় বাঁধেন। তারপর সেটি উবাদার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেন,

এ হচ্ছে সেনাপতির পতাকা। আজ আপনিই সেনাপতি।

এও ছিল উবাদার জীবনে এক পরম পাওয়া!

আল্লাহর ইচ্ছায় উবাদার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আক্রমণেই শহরের পতন ঘটে।

হযরত উবাদা বিভিন্ন সময়ে ইসলামী খিলাফতের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন।

১. সাদাকা বিষয়ক অফিসার

২. ফিলিস্তিনের কাজ

৩. হিমসের আমির।

হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবনের শেষ দিকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে জাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন।

উবাদাকেও রাসূল (সা) একটি অঞ্চলে নিয়োগ দান করেন।

যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উপদেশ দেন :

আল্লাহকে ভয় করবে। এমন যেন না হয়, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জন্তুও তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

রাসূলের (সা) উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

হযরত উবাদার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি চাকর-বাকর, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলকে তার কাছে হাজির করার নির্দেশ দেন।

সবাই উপস্থিত হলে তিনি বলেন :

আজকের এ দিনটিই দুনিয়ায় আমার শেষ দিন।

আর আগত রাতটি আমার আখিরাতের প্রথম রাত।

আমার হাত বা জিহ্বা দিয়ে যদি তোমাদেরকে কোনরকম কষ্ট দিয়ে থাকি তোমরা এখনই তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আমি নিজেকে তোমাদের সামনে পেশ করছি।

তারা বললো, আপনি আমাদের পিতা, আমাদের শিক্ষক।

আপনার কোনো ত্রুটি আমাদের জানা নেই।

আমরা আপনাকে সকল সময় একজন সৎ মানুষ হিসাবেই দেখে আসছি।

আপনি কখন কোন খাদেমকেও খারাপ কথা বলেননি।

উবাদা তাদের অসিয়াত করেন :

আমি মারা গেলে তোমরা কেউ কাঁদবে না।

তোমরা ভালো করে অজু করে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বে।

নামাজ শেষে উবাদা ও তোমাদের নিজেদের জন্য দুয়া করবে।

কারণ, আল্লাহ বলেছেন :

তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।

আমাকে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি কবর দেবে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় যে পাঁচজন আনসারি ব্যক্তি সমগ্র কুরআন হিফজ করেন উবাদা তাঁদের অন্যতম।
তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও সম্মানিত সাহাবীদের একজন।
ইলমুল কিরয়াতে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা।
হযরত রাসূলে করীমের (সা) জীবদ্দশায় মদিনায় আসহাবে সুফ্ফার জন্য ইসলামের প্রথম যে মাদ্রাসাতুল কিরায়াহ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার দায়িত্বে।
অতি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আসহাবে সুফ্ফার সাহাবীরা তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।
শাসকের মুখোমুখি হক কথা বলা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।
তিনি অতি উৎসাহের সাথে এ দায়িত্ব পালন করতেন।
হযরত রাসূলে করীমের (সা) প্রতি উবাদার ছিল তীব্র ভালোবাসা।
প্রথম দফা সাক্ষাতের পর আরও দু'বার মক্কায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বাইয়াত গ্রহণ করে আসেন।

হযরত রাসূলে করীমের (সা) মদিনায় আসার পর এমন কোন ঘটনা বা যুদ্ধ পাওয়া যায় না যাতে যোগদানের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।
এ কারণে তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।
একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিলহানের মেয়ের কাছে গিয়ে কিছুতে ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর হেসে উঠলেন। সে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় সাগর পাড়ি দেবে।
উবাদা আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন আমিও যেন তাদেরই একজন হতে পারি।
রাসূল (সা) দু'য়া করলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাকে তাদেরই একজন করে দাও।
রাসূলের দু'য়া বলে কথা!
আল্লাহপাক রাসূলের দু'য়া কবুল করলেন।
তিনি সাগর পাড়ি দিলেন আল্লাহর রাস্তায়।
কেন দেবেন না!
তিনি নিজেইতো ছিলেন সাহসের এক বিশাল সাগর।
ছিলেন সত্যের পথে আকাশ ছোঁয়া এক বিশাল পর্বত।

www.nagorikpathagar.org

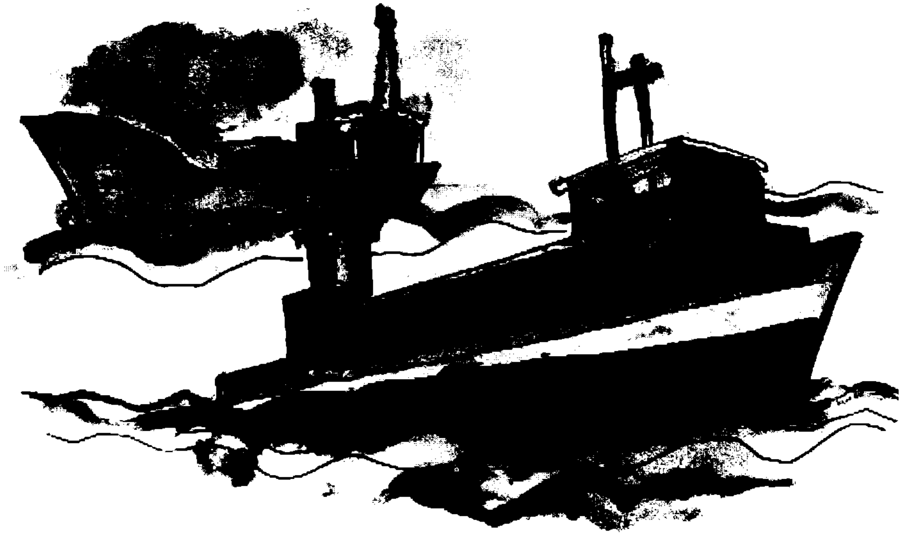

সাগর তলে মানিক জ্বলে

চমৎকার এক সময়।

চারপাশ কেমন আলোকিত।

ঝলমলে।

এমনই সময় ছিল সেটি।

দিন যায়। মাস যায়। বছরও কেটে যায়।

এমনি করে কেটে যায় কতটি কাল!

রয়ে যায় কেবল স্মৃতির চিহ্ন।

যে স্মৃতি মোছে না কখনও। হারায় না কখনও। বরং জ্বলতে থাকে সূর্যের কিরণের মতো।

হযরত আনাসও (রা) তেমনি এক ব্যক্তি।

শুধু ব্যক্তি নন, ব্যক্তিরও অধিক—একজন মহান সাহাবী।

একবার এক দর্জি রাসূলকে (সা) আহারের দাওয়াত দিল।

www.nagorikpathagar.org

আনাসও (রা) সাথে গেলেন।
যবের রুটি এবং শুকনো গোশত ও লাউ-এর তরকারি উপস্থিত করা হলো।
আনাস (রা) দেখলেন, রাসূল (সা) বেছে বেছে লাউ খাচ্ছেন।
সেইদিন থেকে তিনিও লাউ খেতে শুরু করলেন। সেও বড় তৃপ্তির সাথে। ভালোবেসে।
আনাস (রা) বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলো : কিয়ামত কখন হবে?

তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন :
তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?
লোকটি বললো :
কিছুই না। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করি।
রাসূল (সা) বললেন :
তুমি যাদের ভালোবাস তাদের সাথেই থাকবে।
আনাস (রা) বলেন : সেদিন থেকে আবু বকর ও উমারকে বেশি বেশি ভালোবাসি এবং আশা করি এই ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাঁদের সাথেই থাকবো।

কালিমা তাওহিদের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো নামাজ।
হযরত রাসূলে করীম (সা) যে খুশু-খুজু ও আদবের সাথে নামাজ আদায় করতেন সাহাবীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করতেন।
বহু সাহাবীর নামাজ তো ছিল প্রায় রাসূলে (সা) পাকের নামাজের কাছাকাছি।
তবে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাজের সাথে আনাসের নামাজের সাদৃশ্য ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।
একবার তো হযরত আবু হুরাইরা (রা) আনাসকে (রা) নামাজ পড়তে দেখে বলেছিলেন,
আমি ইবন উম্মে সুলাইমের নামাজ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) নামাজের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ আর কারও নামাজ দেখিনি।
নামাজ ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথা ও কাজ সাহাবায়ে কিরামের সামনে ছিল।
হযরত আনাস (রা) দশ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক খাদেম ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

এই সময়কালে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কাজ আনাসের নিকট গোপন থাকতে পারে না।
রাসূল (সা) যা কিছু বলতেন অথবা আমলের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত করতেন তার সবই আনাস স্মৃতিতে ধরে রাখতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করতেন।
একবার খলিফার আমন্ত্রণে তিনি দামেশকে গেলেন।
ফেরার পথে আইনুত তামার নামক স্থানে যাত্রা বিরতির ইচ্ছা করলেন।
ছাত্র ও ভক্তদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেল।
তারা নির্ধারিত দিনে উক্ত স্থানে সমবেত হলো, লোকালয়ের বাইরে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্য দিয়ে তাঁর উট এগিয়ে আসছিল।
তখন ছিল নামাজের সময়।
লোকেরা দেখলো, তিনি উটের পিঠে নামাজরত; কিন্তু উটটি কিবলামুখী নয়।

ছাত্ররা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন :
আপনি এ কেমনভাবে নামাজ আদায় করছিলেন?
হযরত আনাস (রা) বললেন : আমি যদি রাসূলুল্লাহকে (সা) এভাবে নামাজ আদায় করতে না দেখতাম, তাহলে কক্ষণও আমি এভাবে আদায় করতাম না।
একবার ইবরাহিম ইবন রাবিয়া হযরত আনাসের (রা) নিকট আসলেন।
হযরত আনাস (রা) একখানা কাপড়ের একপাশ পরে অন্য পাশ গায়ে জড়িয়ে নামাজে মশগুল ছিলেন।

নামাজ শেষ হলে ইবরাহিম জিজ্ঞেস করলেন :
আপনি এভাবে এক কাপড়ে নামাজ পড়েন?
আনাস বললেন : হাঁ, আমি এভাবে রাসূলকে (সা) নামাজ পড়তে দেখেছিলাম।
উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে করীম (সা) জীবনের সর্বশেষ নামাজ–যে নামাজ হযরত আবু বকরের (রা) পেছনে পড়েছিলেন, তা এক কাপড়েই ছিল।
হযরত রাসূলে করীমের (সা) পবিত্র জীবনের প্রতিটি আচরণ ও পদক্ষেপ ছিল হযরত আনাসের (রা) জীবন পথের দিশারি।
ফরজ ছাড়াও ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহেও রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাঁর আদর্শ।
তিনি ছোট-বড় সকলকে সালাম করতেন।
সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন।
তিনি বলতেন, আমাকে রাসূল (সা) বলেছেন :
আনাস (রা), তুমি যখন ঘর থেকে বের হবে, তারপর যার সাথে দেখা হবে,

www.nagorikpathagar.org

সকলকে সালাম করবে। কারণ, তুমি জান না তোমার মৃত্যু কখন আসবে।
প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কোরবানি প্রয়োজন।
হযরত আনাস ছিলেন একজন বিত্তশালী রয়িস বা নেতা।
যতগুলি পশু ইচ্ছা, কোরবানি করতে পারতেন।
কিন্তু খায়রুল কুরূন—সর্বোত্তম যুগের লোকদের নিকট নাম-কামের চেয়ে রাসূলের (সা) অনুসরণ করা ছিল সব কিছুর ঊর্ধ্বে।
সে যুগের লোকেরা খ্যাতির জন্য নয়; বরং সওয়াবের জন্যই কোরবানি করতেন।
হযরত রাসূলে করীম (সা) দুইটি পশু কোরবানি করতেন, এই জন্য হযরত আনাসও (রা) দুইটিই করতেন।
উমাইয়্যা শাসন আমলে হযরত উমার ইবন আবদুল আজিজ (রা) যুবরাজ থাকাকালে একবার মদিনায় গভর্নর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।
যুবরাজ যেহেতু শাহি খান্দানের সদস্য ছিলেন, এ কারণে জাতীয় জীবনের অনেক কিছুই তাঁর জানা ছিল না।
সে যুগের প্রচলন অনুযায়ী নিজেই নামাজের ইমামতি করতেন এবং মাঝে মধ্যে কিছু ভুল-ক্রুটিও হয়ে যেত।
হযরত আনাস (রা) প্রায়ই তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন।
তিনি একবার হযরত আনাসকে (রা) বললেন, আপনি এভাবে আমার বিরোধিতা করেন কেন?

হযরত আনাস (রা) বললেন : আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) নামাজ পড়তে দেখেছি আপনি যদি সেইভাবে নামাজ পড়ান তাহলে আমি সন্তুষ্ট হবো।
অন্যথায় আপনার পেছনে নামাজ আদায় করবো না।
হযরত উমার ইবন আবদুল আজিজ ছিলেন বুদ্ধিমান ও সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি।

হযরত আনাসের কথায় তিনি প্রভাবিত হলেন।
তিনি আনাসকে উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করলেন।
কিছুদিন তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি এমন সুন্দর নামাজ পড়াতে লাগলেন যে, খোদ আনাসই (রা) বলতে লাগলেন, এই ছেলের নামাজের চেয়ে আর কারও নামাজ রাসূলুল্লাহর (সা) নামাজের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

www.nagorikpathagar.org

একবার খলিফা আবদুল মালিক হযরত আনাসসহ আরও চল্লিশজন আনসারি ব্যক্তিকে দামেশ্‌কে ডেকে পাঠান।
সেখান থেকে ফেরার পথে ফাজ্জুন নাকাহ নামক স্থানে পৌঁছলে আসর নামাজের সময় হয়ে যায়। যেহেতু সফর তখনও শেষ হয়নি, এই কারণে হযরত আনাস (রা) দুই রাকায়াত নামাজ পড়ান। তবে কিছু লোক আরও দুই রাকায়াত পড়ে চার রাকায়াত পুরো করেন।

একথা হযরত আনাস জানতে পেরে দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আল্লাহ যখন কসরের অনুমতি দিয়েছেন তখন এ সুবিধা গ্রহণ করবে না কেন?
আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ দীনের ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে। আসলে তারা দীনের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে থাকবে গাফিল।
সত্যকথা বলা এবং সত্যকে পছন্দ করা ছিল হযরত আনাসের চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।
খিলাফতে রাশেদার প্রথম দুই খলিফার পর এমন অনেক যুবক সরকারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয় যারা ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।
এজন্য তাদের অনেক কাজই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হতো।
যে সাহাবায়ে কিরাম জীবনের বিনিময়ে ইসলাম খরিদ করেছিলেন তাঁরা এটা সহ্য করতে পারতেন না।

তাঁরা ভয়–ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে সব সময় সত্য কথাটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন।
হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন।
তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু স্বৈরাচারী শাসকের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন যাদের তিনি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে তাদের সতর্ক করে দিতেন।
ইয়াজিদের সময়ে আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন ইরাকের গভর্নর।
তাঁর নির্দেশে হযরত ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা সামনে আনা হলে তিনি হাতের ছড়িটি দিয়ে হযরত হুসাইনের চোখে টোকা দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অশালীন কটাক্ষ করেন।

হযরত আনাস (রা) নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন : এই চেহারা রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উমাইয়্যা রাজবংশের বিখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস-সাকাফি নিজের ছেলেকে বসরার কাজি নিয়োগ করতে চায়। হাদিস শরীফে বিচারক অথবা আমিরের পদের আকাঙ্ক্ষী হবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হযরত আনাস হাজ্জাজের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বলেন : এমনটি করতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

উমাইয়্যা শাসকদের আর এক আমির হাকাম ইবন আইউব। তাঁর নৃশংসতা মানুষের সীমা অতিক্রম করে জীব-জন্তু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
একবার হযরত আনাস (রা) তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, মুরগির পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হচ্ছে। তীর লাগলে মুরগিটি ছটফট করছে। হযরত আনাস এ দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং মানুষকে তাদের এ কাজের জন্য ধিক্কার দিলেন।
একবার কিছু লোক জোহরের নামাজ আদায় করে হযরত আনাসের সাক্ষাতের জন্য আসে।
তিনি তখন চাকরের নিকট অজুর পানি চাইলেন।
লোকেরা জানতে চাইলো, এ কোন নামাজের প্রস্তুতি?
বললেন : আসর নামাজের।
এক ব্যক্তি বললো : আমরা তো এখনই জোহর পড়ে এলাম।
হযরত আনাস আমির উমরাহের দীনের প্রতি উদাসীনতা এবং জনগণের দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন।

তিনি বললেন : এ তো হবে মুনাফিকদের নামাজ।
মানুষ বেকার বসে থাকবে, তবুও নামাজের জন্য উঠবে না। যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকবে তখন খুব তাড়াতাড়ি মোরগের মত চারটি ঠোকর মেরে দেবে। সেই ঠোকরে আল্লাহর স্মরণ থাকবে অতি অল্পই।
প্রকৃত দীনদারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ দান করা। আর এজন্যই কুরআন মজিদে উম্মাতে মুসলিমাকে সর্বোত্তম উম্মাত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।
হযরত আনাসের মধ্যে এই গুণটির বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল।
একবার উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের একটি মজলিসে হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। উবাইদুল্লাহ এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।
একথা হযরত আনাসের (রা) কানে গেল। তিনি সরাসরি উবাইদুল্লাহর দরবারে

www.nagorikpathagar.org

উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন : তোমার এখানে কি হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল?

বললেন : হাঁ। কেন, রাসূল (সা) কি এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

হযরত আনাস (রা) হাউজে কাওসার সম্পর্কে রাসূলের (সা) হাদিস তাঁকে শুনিয়ে ফিরে আসেন। হযরত মুসয়াব ইবন উমাইর (রা) একজন আনসারি ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট পেলেন।

এই অপরাধের জন্য তিনি লোকটিকে পাকড়াও করার চিন্তা করলেন।

লোকেরা হযরত আনাসকে কথাটি জানালেন।

তিনি সোজা মুসয়াবের কাছে গিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্য আমিরদের অসিয়াত করেছেন।

এই হাদিস শুনামাত্র মুসয়াব ইবন উমাইর (রা) খাট থেকে নিচে নেমে এসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশের স্থান আমার চোখের ওপর।

আমি লোকটিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

সাবিত আন–নাবানী বলেন : একদিন আমি বসরার যাবিয়া নামক স্থানে আনাসের সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় আজান শোনা গেল।

সাথে সাথে আনাস (রা) মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলেন এবং এভাবে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : নামাজের জন্য আমার পদক্ষেপ যাতে বেশি হয়, সেই জন্য।

হযরত আনাস ইলম হাসিলের চেয়ে অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমলের ওপর বেশি জোর দিতেন।

তিনি বলতেন : যত ইচ্ছা জ্ঞান হাসিল কর। তবে আল্লাহর কসম, আমল না করলে সে সব জ্ঞানের প্রতিদান দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলতেন : প্রকৃত আলেমের কাজ বুঝা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আর মূর্খদের কাজ শুধু বর্ণনা করা।

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন।

এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদিস বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সা) বলেছেন : যে আমার সুন্নাত ছেড়ে দেবে সে আমার উম্মাতের কেউ নয়।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরও বলেছেন : যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলেন, যেমন : জুতো, একটি চাদর, একটি পিয়ালা, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি ইত্যাদি।

হজরত আনাস (রা) বলতেন : আমার মা উম্মু সুলাইম মৃত্যুকালে আমার জন্য রেখে যান রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চাদর, একটি পিয়ালা যাতে তিনি পানি পান করতেন, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি এবং একটি শীলা যার ওপর আমার মা রাসূলুল্লাহর (সা) ঘাম মিশিয়ে সুগন্ধি পিষতেন।
এভাবে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) সম্পর্কে টুকরো টুকরো তথ্য হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থ সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা খুবই চমকপ্রদ এবং মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকর।

শুধু কল্যাণকরই নয়, শিক্ষণীয় বটে।
হযরত আনাস (রা) মূলত ছিলেন একজন বড়ো মাপের সাহাবী।
তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) আদর্শ ও ভালোবাসায় উজ্জীবিত।
তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো উদ্ভাসিত।
যেন নক্ষত্র নয়, প্লাবিত জোসনা। কিংবা তার চেয়েও অধিক কিছু।
যে আলো ছড়িয়ে পড়তো জমিনে।
যে আলো পৌঁছে যেত সাগরের তলদেশ। যেন সাগর তলে মানিক জ্বলে!
এমনি অনুকরণীয় ছিলেন হযরত আনাস (রা)।
ঠিক যেন জোসনা ধোয়া চাঁদ।

www.nagorikpathagar.org

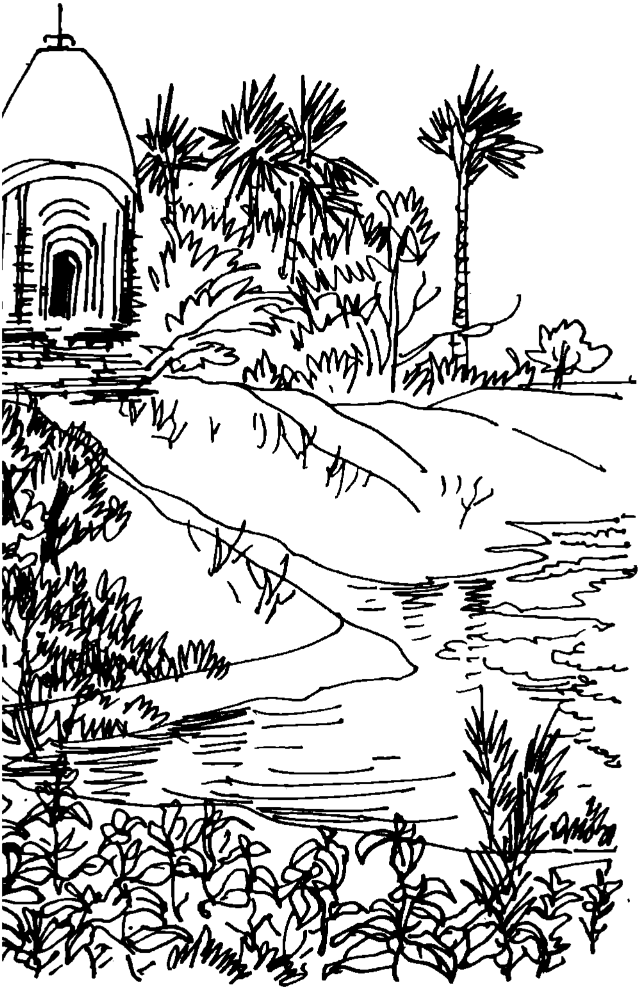

াগে

হ !

্সী যুবক!

মাউয়াল মাসে জিকারাদ বা গাবা অভিযান পরিচালিত হয়।

দারুণ দুঃসাহসের পরিচয় দান করেন।

মর (সা) উটগুলো জিকারাদ নামক একটি পল্লীতে চরতো।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহর (সা) দাস রাবাহ ছিলেন সেই উটগুলোর দায়িত্বে। গাতফান গোত্রের কিছু লোক রাখালদের হত্যা করে উটগুলো লুট করে নিয়ে যায়। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালামা ইবন আকওয়া এ সংবাদ পেয়ে আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মদিনার দিকে মুখ করে শত্রুর আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি ইয়া সাবাহাহ্! বলে তিনবার চিৎকার দেন। অন্য দিকে রাবাহকে দ্রুত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গাতফানি লুটেরাদের পেছনে ধাওয়া করেন।

হযরত রাসূলে করীম (সা) তাঁকে সাহায্যের জন্য দ্রুত তিনজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের পেছনে তিনি নিজেও বেরিয়ে পড়েন।

সালামা ইবন আকওয়া মদিনার সাহায্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, আবু কাতাদাহ আল-আনসারি, আল-আখরাম, আল-আসাদি এবং তাঁদের পেছনে মিকদাদ আল-কিন্দি বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন।

এই অশ্বারোহীদের দেখে গাতফানিরা উট ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আল-আখরাম, আল-আসাদির মধ্যে তখন শাহাদাতের তীব্র বাসনা কাজ করছে।

তিনি সালামার নিষেধ অমান্য করে গাতফানিদের পিছে ধাওয়া করেন।

এক পর্যায়ে আবদুর রহমান আল-আখরামের ঘোড়াটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় আবু কাতাদাহ এসে উপস্থিত হন এবং তিনি বর্শার এক খোঁচায় আবদুর রহমানকে হত্যা করেন।

কেউ বলেন, এই জিকারাদ যুদ্ধে আবু কাতাদাহ যাকে হত্যা করেন তার নাম হাবিব ইবন উয়াইনা ইবন হিসন।

তিনি হাবিবকে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে শত্রুর পেছনে আরও এগিয়ে যান।

পেছনের লোকেরা যখন দেখতে পেল, আবু কাতাদাহর চাদর দিয়ে একটি লাশ ঢাকা তখন তারা মনে করলো, নিশ্চয়ই এ আবু কাতাদাহর লাশ। সাথে সাথে তারা ইন্নালিল্লাহ উচ্চারণ করলো। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো : আবু কাতাদাহ নিহত হয়েছে।

এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন : আবু কাতাদাহ্ নয়; বরং আবু কাতাদাহর হাতে নিহত ব্যক্তির লাশ। সে একে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে, যাতে তোমরা বুঝতে পার, এর ঘাতক সেই।

www.nagorikpathagar.org

আবু কাতাদাহ বলেন, জিকারাদের দিন অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন : হে আল্লাহ! তুমি তার কেশ ও ত্বকে বরকত দাও। তার চেহারাকে কামিয়াব কর।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার চেহারাও কামিয়াব করুন!

এ দিন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করেন : আবু কাতাদাহ আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী।

হুদাইবিয়া সন্ধির সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবু কাতাদাহও ছিলেন। এ সফরে ফেরার পথে একদিন রাসূল (সা)সহ তাঁর সফর সঙ্গীদের ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যায়। সে কাজা নামাজ কখন কিভাবে রাসূল (সা) আদায় করেছিলেন তার একটা বিবরণ আবু কাতাদাহ্ বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়।

হিজরি সপ্তম অথবা অষ্টম সনে রাসূল (সা) আবু কাতাদাহর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইদামের দিকে পাঠান।

এই ইদাম একটি স্থান বা একটি পাহাড়ের নাম এবং মদিনা থেকে শামের রাস্তায় অবস্থিত।

তাঁরা ইদাম উপত্যকায় পৌঁছানোর পর তাঁদের পাশ দিয়ে আমের ইবন আল-আদবাত আল-আশজায়ী যাচ্ছিলেন।

তিনি আবু কাতাদাহ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যদের সালাম দিলেন।

তা সত্ত্বেও পূর্ব-শত্রুতার কারণে এ বাহিনীর সদস্য মুহাল্লিম ইবন জাসসামা ইবন কায়েস তাঁকে হত্যা করেন এবং তাঁর উট ও অন্যান্য জিনিস ছিনিয়ে নেন।

তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে যখন তাঁকে এ ঘটনা অবহিত করেন তখন সূরা আন নিসার ৯৪ নং আয়াতটি নাজিল হয় "হে মুমিনগণ!

তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নেবে।

কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে ইহ-জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না, তুমি মুমিন নও।

কারণ, আল্লাহর নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর আছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।"

হিজরি ৮ম সনের শাবান মাসে রাসূল (সা) নাজদের খাদরাহ্ নামক স্থানের দিকে ১৫ সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। আবু কাতাদাহ্ ছিলেন এই বাহিনীর

www.nagorikpathagar.org

আমির।

সেখানে গাতফান গোত্রের বসতি ছিল। তারা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রু এক লুটেরা গোত্র। তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে সারা রাত চলতেন এবং দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন।

এভাবে হঠাৎ তাঁরা গাতফান গোত্রে পৌঁছে যান। তারাও ছিল ভীষণ সাহসী। সাথে সাথে বহুলোক উপস্থিত হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু হলো।

আবু কাতাদাহ্ সঙ্গীদের বললেন, যারা তোমাদের সাথে লড়বে শুধু তাদেরকেই হত্যা করবে। সবাইকে ধাওয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

এমন নীতি গ্রহণের ফলে দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। মাত্র ১৫ দিন পর প্রচুর গনিমতের মাল সঙ্গে নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর আল্লাহর রাসূল (সা) রমজান মাসে আটজন লোকের একটি দল বাতানে আখামের দিকে পাঠান।

এঁদেরও নেতা ছিলেন আবু কাতাদাহ।

রাসূল (সা) মক্কায় সেনা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মানুষ যাতে এ কথা মোটেই বুঝতে না পারে এ জন্য এই দলটিকে পাঠান।

মূলত মানুষের চিন্তা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেন।

জি-খাশাব পৌঁছার পর এ দলটি জানতে পেল যে, রাসূল (সা) মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁরা সুকাইয়্যা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহিনীর সাথে মিলিত হন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে লড়াই এত তীব্র ছিল যে, মুসলমানদের অনেক বড় বড় বীরও পিছু হঠতে বাধ্য হন।

আবু কাতাদাহ্ এ যুদ্ধে দারুণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

এক স্থানে একজন মুসলমান ও একজন মুশরিক সৈনিকের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হচ্ছে। দ্বিতীয় একজন পেছন দিক থেকে মুসলিম সৈনিককে আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। ব্যাপারটি আবু কাতাদাহর নজরে পড়লো।

তিনি চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে পেছন দিক থেকে লোকটির কাঁধে তরবারির ঘা বসিয়ে দিলেন।

লোকটির একটি হাত কেটে পড়ে গেল; কিন্তু অতর্কিতে সে দ্বিতীয় হাতটি দিয়ে আবু কাতাদাহকে চাপ দিল যে, তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো।

দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে, এর মধ্যে লোকটির দেহ থেকে প্রচুর রক্তরণ হওয়ায় সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই সুযোগে আবু কাতাদাহ লোকটির দেহে আরেকটি ঘা বসিয়ে দেন, লোকটি

www.nagorikpathagar.org

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এরপর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দারুণ ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। তারা ময়দান থেকে যে যেদিকে পারে, পালিয়ে যাচ্ছিল।

আবু কাতাদাহও এক দিকে যাচ্ছেন। পথে এক স্থানে হযরত উমারের (রা) সাথে দেখা। আবু কাতাদাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : কী ব্যাপার?

উমার (রা) বললেন : আল্লাহর যা ইচ্ছা। এর মধ্যে মুসলমানরা দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং রণক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক সাহচর্য ও খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেন, পানি কোথায় আছে তা খুঁজে বের কর অন্যথায় সকালে ঘুম থেকে পিপাসিত অবস্থায় উঠতে হবে।

লোকেরা পানির তালাশে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু হযরত আবু কাতাদাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থেকে গেলেন।

রাসূল (সা) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন।

ঘুমকাতর অবস্থায় তিনি যখন এক দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন তখন আবু কাতাদাহ এগিয়ে গিয়ে নিজের হাত দিয়ে সে দিকে ঠেস দিচ্ছিলেন।

একবার তো রাসূল (সা) পড়ে যাবারই উপক্রম হলো। আবু কাতাদাহ দ্রুত হাত দিয়ে ঠেকালেন। রাসূল (সা) চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন : কে?

বললেন : আবু কাতাদাহ।

রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কখন থেকে আমার সাথে আছ?

বললেন : সন্ধ্যা থেকে।

তখন রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন এই বলে : হে আল্লাহ! আপনি আবু কাতাদাহকে হিফাজত করুন যেমন সে সারা রাত আমার হিফাজত করেছে।

একবার হযরত আবু কাতাদাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিজা প্রত্যক্ষ করেন। আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে ছিলাম। এক সময় যাত্রা বিরতিকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের সাথে কি পানি আছে?

বললাম : হ্যাঁ। আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু পানি আছে।

বললেন : নিয়ে এসো।

আমি পানির পাত্রটি নিয়ে এলাম।

তিনি বললেন : এর থেকে কিছু পানি নিয়ে তোমরা সবাই অজু কর।

অজুর পর সেই পাত্রে এক ঢোক মত পানি থাকলো।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা) বললেন : আবু কাতাদাহ্, তুমি এ পানিটুকু হিফাজতে রেখে দাও। খুব শিগগিরই এর একটি খবর হবে।

আস্তে আস্তে দুপুরের প্রচণ্ড গরম শুরু হলো।

রাসূল (সা) সঙ্গীদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারা সবাই বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিপাসায় তো আমাদের জীবন যায় যায় অবস্থা।

তিনি বললেন : না, তোমরা মরবে না।

এই বলে তিনি আবু কাতাদাহকে ডেকে পানির পাত্রটি নিয়ে আসতে বললেন।

আবু কাতাদাহ্ বলেন : আমি পাত্রটি নিয়ে এলাম।

রাসূল (সা) বললেন : আমার পিয়ালাটি নিয়ে এসো।

পিয়ালা আনা হলো।

তিনি পাত্র থেকে একটু করে পানি পিয়ালায় ঢেলে মানুষকে পান করাতে লাগলেন।

পানি পানের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) চারপাশে ভিড় জমে গেল।

আবু কাতাদাহ্ বলেন : একমাত্র রাসূল (সা) ও আমি ছাড়া সকলের পান শেষ হলে তিনি বললেন : আবু কাতাদাহ্ এবার তুমি পান কর।

আমি বললাম : আপনি আগে পান করুন।

তিনি বললেন : সম্প্রদায়ের যিনি সাকি বা পানি পান করান, তিনি সবার শেষে পান করেন।

অতঃপর আমি পান করলাম এবং সবার শেষে রাসূল (সা) পান করলেন।

সবার পান করার পরও পাত্রে ঠিক যতটুকু পানি ছিল তাই থেকে গেল।

সে দিন তিন শো লোক ছিল। অন্য একটি বর্ণনা মতে, লোক সংখ্যা ছিল সাতশো।

আবু কাতাদাহ! যুবক তো নয়, যেন দরিয়ার এক তুমুল জোয়ার! যে জোয়ারের বেগ এবং তেজ রুখতে পারে না কেউ। তিনি রাসূলকে (সা) যেমন ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, ঠিক তেমনি ভালোবাসতেন ইসলামকে।

আল্লাহর ভয়ে এই কোমল এবং সাহসী মানুষটি সকল সময় থাকতেন প্রকম্পিত।

আবু কাতাদাহ! তাঁর জীবন থেকে আমরা অনেক কিছুই শিক্ষা নিতে পারি। নেয়াই উচিত।

কারণ আমরাও তো চাই আমাদের সফল জীবন!

www.nagorikpathagar.org

ঢেউ ভাঙা সাম্পান

তের পরই আসে দিন।
ধারের পরই আসে আলো।
ন উদিত হয় সূর্য তখন চারদিক কী ফকফকা!
মনি একটি জীবন-আলোকিত জীবন।
ম হযরত উবাই (রা)।

রত উবাই বদর থেকে নিয়ে তায়িফ অভিযান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) বদ্দশায় যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যোগদান করেন সাহসের সাথে।

রাইশরা বদরে পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে প্রতিশোধ নেয়ার তোড়জোড় শুরু রে দেয়।

হুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কায় অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত ব্বাস ইবন আবদুল মুত্তাবিল গোপনে বনি গিফার গোত্রের এক লোকের ধ্যমে একটি পত্র রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। সেই পত্রে তিনি

কুরাইশদের সকল গতিবিধি রাসূলকে (সা) অবহিত করেন।
লোকটি মদিনার উপকণ্ঠে কুবায় পত্রখানি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হস্তান্তর করেন।
রাসূল (সা) পত্রখানা সেখানে উবাই ইবন কাবের দ্বারা পাঠ করিয়ে শোনেন এবং পত্রের বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ দেন।
এই উহুদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি আহত হন।
হযরত রাসূল (সা) তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক পাঠান।
চিকিৎসক তাঁর রগ কাটা স্থানে সেঁক দেয়।
উহুদ যুদ্ধের শেষে হযরত রাসূলে করীম (সা) আহত-নিহতদের খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন : তোমাদের কেউ একজন সাদ ইবন রাবির খোঁজ নাও তো।

একজন আনসারি সাহাবী তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় শহীদদের লাশের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করেন। এই আনসারি সাহাবী হলেন উবাই ইবন কাব।
খন্দকযুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, আবু উসামা আল-জাশামির মারফত একটি চিঠি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। সেই চিঠিও রাসূল (সা) উবাইয়ের দ্বারা পাঠ করান।
তেমনিভাবে হিজরি ২য় সনের রজব মাসে রাসূল (সা) আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদির নেতৃত্বে একটি বাহিনী নাখলা অভিমুখে পাঠান।
যাত্রাকালে তিনি আবদুল্লাহর হাতে একটি সিলকৃত চিঠি দিয়ে বলেন : দুই রাত একাধারে চলার পর চিঠিটি খুলে পাঠ করবে এবং এর নির্দেশ মত কাজ করবে।

রাসূল (সা) এই চিঠিটি উবাইয়ের দ্বারা লেখান।
হিজরি ৯ম সনে জাকাত ফরজ হলে রাসূল (সা) আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে জাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন।
তিনি উবাইকে বালি, আজরা এবং বনি সাদ গোত্রে জাকাত আদায়কারী হিসাবে পাঠান।
তিনি অত্যন্ত দ্বীনদারি ও সততার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।
একবার এক জনবসতিতে গেলেন জাকাত আদায় করতে। নিয়ম অনুযায়ী এক ব্যক্তি তার সকল গবাদিপশু উবাইয়ের সামনে হাজির করে, যাতে তিনি যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

উবাই উটের পাল থেকে দুই বছরের একটি বাচ্চা গ্রহণ করেন।
জাকাতদানকারী বললেন :
এতটুকু বাচ্চা নিয়ে কী হবে? এতো দুধও দেয় না, আরোহণেরও উপযোগী নয়। আপনি যদি নিতে চান এই মোটা তাজা উটনীটি নিন।
উবাই বললেন : আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের বিপরীত আমি কিছুই করতে পারি না। মদিনা তো এখান থেকে খুব বেশি দূর না, তুমি আমার সাথে চলো, বিষয়টি আমরা রাসূলকে (সা) জানাই। তিনি যা বলবেন, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবো।
লোকটি রাজি হলো। সে তার উটনী নিয়ে উবাইয়ের সাথে মদিনায় উপস্থিত হলো।

তাদের কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন : এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে উটনী দাও, গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন।
লোকটি সন্তুষ্টচিত্তে উটনীটি দান করে বাড়ি ফিরে গেল।
হযরত রাসূলে করীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়।
সাহাবা-ই-কিরামের যে দলটির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়, উবাই ছিলেন তাঁদের নেতা। তিনি কুরআনের শব্দাবলি উচ্চারণ করতেন, আর অন্যরা লিখতেন।

এই দলটির সকলেই ছিলেন উঁচু স্তরের আলিম। এই কারণে মাঝে মধ্যে কোন কোন আয়াত সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হতো।
যখন সূরা আত-তাওবার ১২৭ নম্বর আয়াতটি লেখা হয় তখন দলের অন্য সদস্যরা বললেন, এই আয়াতটি সর্বশেষ নাজিল হয়েছে।
হযরত উবাই বললেন : না। রাসূল (সা)-এর পরে আরও দু'টি আয়াত আমাকে শিখিয়েছিলেন। সূরা আত-তাওবার ১২৮ নম্বর আয়াতটি সর্বশেষ নাজিল হয়েছে।
হযরত আবু বকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত উমার (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।
তিনি তাঁর খিলাফতকালে অসংখ্য জনকল্যাণ ও সংস্কারমূলক কাজের প্রবর্তন করেন।

www.nagorikpathagar.org

মজলিসে সূরা তার মধ্যে একটি।

বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে এই মজলিস গঠিত হয়। খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে উবাই এই মজলিসে সদস্য ছিলেন।

হযরত উমারের খিলাফতকালের গোটা সময়টা তিনি মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে কাটান। বেশির ভাগ সময় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যয় করেন।

যখন মুজলিসে শূরার অধিবেশন বসতো বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো খলিফা উমার (রা) তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালের পুরো সময়টা তিনি ইফতার পদে আসীন ছিলেন। এছাড়া অন্য কোন পদ তিনি লাভ করেননি।

একবার উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে কোন এক স্থানের ওয়ালি নিযুক্ত করেন না কেন?

উমার (রা) বললেন : আমি আপনার দ্বীনকে দুনিয়ার দ্বারা কলুষিত হতে দেখতে চাই না।

হযরত উমার (রা) যখন তারাবিহর নামাজ জামায়াতের সাথে আদায়ের প্রচলন করেন তখন উবাইকে ইমাম মনোনীত করেন।

উমার যেমন তাঁকে সম্মান করতেন তেমনি ভয়ও করতেন। তাঁর কাছে ফাতওয়া চাইতেন।

খলিফা উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরে উবাই তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

খলিফার ঐতিহাসিক জাবিয়া ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাইতুল মাকদাসের অধিবাসীদের সাথে হযরত উমার (রা) যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন তার লেখক ছিলেন হযরত উবাই।

উমারের পর হযরত উসমানের (রা) সময় খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন মজিদের তিলাওয়াত ও উচ্চারণে বিভিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা উসমান (রা) শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

তিনি এই বিভিন্নতা দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তিনি শ্রেষ্ঠ ক্বারিদের ডেকে পৃথকভাবে তাঁদের তিলাওয়াত শুনলেন।

উবাই ইবন কাব আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং মুয়াজ ইবন জাবাল- প্রত্যেকেরই উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সকল মুসলমানকে একই উচ্চারণের কুরআনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে চাই।

সেই সময় কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে ১২ ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনে দক্ষ

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। খলিফা উসমান এই ১২ জনের ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। আর এই পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব দান করেন উবাই ইবন কাবকে।
তিনি শব্দাবলি উচ্চারণ করতেন, যায়িদ ইবন সাবিত লিখতেন।
আজ পৃথিবীতে যে কুরআন বিদ্যমান তা মূলত হযরত উবাইয়ের পাঠের অনুলিপি।
হযরত উবাইয়ের মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে হিজরি ৩৯ সনের এক জুমার দিনে ইনতিকাল করেন।
হযরত উসমান তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান এবং মদিনায় মারা যান।
আর ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ প্রমুখের মতে তাঁর মৃত্যু হয় হিজরি ৩৯ সনে।

তার সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে যে সকল সন্তানদের নাম জানা যায় তারা হলেন : ১. তুফাইল, ২. মুহাম্মাদ, ৩. রাবি, ৪. উম্মু উমার।
প্রথমোক্ত দুইজন হযরত রাসূলে করীমের (সা) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর স্ত্রীর ডাকনাম উম্মু তুফাইল। তিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। হাদিস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নামটিও দেখা যায়।
হযরত উবাইয়ের দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির হালকা-পাতলা ধরনের। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌর বর্ণের।
বার্ধক্যে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু খিজাব লাগাতেন না।
স্বভাব ছিল একটু সৌখিন প্রকৃতির।
বাড়িতে গদির ওপর বসতেন।
ঘরের দেয়ালে আয়না লাগিয়েছিলেন এবং সেইদিকে মুখ করে নিয়মিত চিরুনি করতেন।

সাধারণত স্বভাববিরোধী কোন কথা শুনলেই রেগে যেতেন।
হযরত উবাই ছিলেন একটু স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।
একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) মদিনার একটি গলি দিয়ে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, পেছন থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, উমার। কাছে এসে ইবন আব্বাসকে বললেন : তুমি আমার দাসকে সঙ্গে নিয়ে উবাই ইবন কাবের নিকট যাবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কি অমুক

www.nagorikpathagar.org

আয়াতটি এভাবে পড়েছেন?

ইবন আব্বাস উবাইয়ের গৃহে পৌঁছুলেন এবং পরপরই উমারও সেখানে হাজির হলেন। অনুমতি নিয়ে তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করলেন।

উবাই তখন দেওয়ালের দিকে মুখ করে মাথার চুল ঠিক করছিলেন।

উমারকে গদির ওপর বসানো হলো।

উবাইয়ের পিঠ ছিল উমারের দিকে এবং সেই অবস্থায়ই বসে থাকলেন, পিছনে তাকালেন না। কিছুক্ষণ পর বললেন : আমিরুল মুমিনীন, স্বাগত! আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে না অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছেন?

উমার বললেন : একটি কাজে এসেছি।

অতঃপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন–এর উচ্চারণ তো খুব কঠিন।

উবাই বললেন : আমি কুরআন তাঁর নিকট থেকেই শিখেছি, যিনি জিবরিলের নিকট থেকে শিখেছিলেন। এ তো খুব সহজ ও কোমল।

হযরত উবাই ইবন কাবের পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জ্ঞান চর্চার জন্য নিবেদিত ছিল।

মদিনার আনসার-মুহাজিরগণ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকতো, হযরত উবাই তখন মসজিদে নববীতে কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন-পাঠনে সময় অতিবাহিত করতেন।

আনসারদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম কেউ ছিলেন না। আর কুরআন বুঝার দক্ষতা এবং হিফজ ও কিরআতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

খোদ রাসূলে করীম (সা) মাঝে মাঝে তাঁর নিকট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন।

হযরত উবাই (রা)! তিনি ছিলেন সত্যের ধারক। ছিলেন সত্য পথের অবিরাম যাত্রী। তার ছিল অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

যা অনুকরণ করলে আমরাও স্পর্শ করতে পারি সত্যের ঢেউ ভাঙা সাম্পান!

www.nagorikpathagar.org

া-তো নন, সাওর পর্বত

াসমা বিনতে আবু বকর (রা)।

ক মহান মহিলা সাহাবী। পিতাও ছিলেন প্রথম খলিফা এবং খুব মর্যাদাবা ক সাহাবী হযরত আবু বকর (রা)।

াসমা ছিলেন চরিত্রের দিক থেকে যেমন সুদৃঢ়, তেমনি ছিলেন সাহসিনী। থম যুগেই যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন, হযরত আসমা ছিলেন তাদে :ধ্য অন্যতম।

াই সময় মাত্র সতের জন নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণের এই সোনালি সুযো াজে লাগাতে পেরেছিলেন। এই দিক থেকেও তিনি দারুণ সৌভাগ্যবতী। যরত আসমাকে বলা হতো জাতুন নিতাকাইন।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ দু'টি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী। এটা কেন বলা হতো?
কারণ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের সময় আসমা রাসূল (সা) ও তার পিতা আবু বকরের জন্য থলিতে পাত্রে ও মশকে পানি ভরে দিয়েছিলেন। ভরাও শেষ। এবার মুখ দু'টি বাঁধার পালা।
কিন্তু কী দিয়ে বাঁধবেন? হাতের কাছে তেমন কিছুই পেলেন না। অবশেষে নিজের কোমর বন্ধনী খুলে দু'টুকরো করে তাই দিয়েই পাত্র দু'টির মুখ শক্ত করে বেঁধে দিলেন।

আসমার এই বুদ্ধিদীপ্ত কাজটি দেখলেন রাসূল (সা)। দেখলেন আর হাসলেন। দয়ার নবীজীর বুকটা ভরে গেল আনন্দে। তিনি দুয়া করলেন আসমার জন্য :
'আল্লাহ্ পাক যেন এর বিনিময়ে জান্নাতে তাকে দু'টি নিতাক দান করেন।'
আবু বকরের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে ছিল না কোনো গর্ব বা অহঙ্কার। ছিল না এতটুকু দেমাগ।

বিয়ের পর, দরিদ্র স্বামীর ঘরে গেলেন আসমা। দরিদ্র মানে, হত দরিদ্র। একেবারেই নিঃস্ব বলা যায়।
স্বামীর একটি মাত্র ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ছিল না ফুট-ফরমায়েশ খাটার মতো কোনো চাকর-বাকরও। তা না থাক। এসব নিয়ে আসমার মনে কোনো কষ্ট বা দুঃখও ছিল না। ছিল না বুকের মধ্যে সামান্যতম বেদনার মেঘ। বরং তিনি হাসিমুখে সবই মেনে নিতেন। স্বামীসেবা করতেন, ঘোড়ার জন্য ভুসি পিষতেন, ঘোড়াটিকে দেখাশুনা করতেন এবং সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতেন।

পরে অবশ্য কেটে গিয়েছিল তাদের কষ্টের কাল।
আল্লাহর রহমত আর নবীজির আন্তরিক দোয়ার বরকতে এক সময় তারা অনেক ধন-সম্পদের মালিকও হয়েছিলেন।
হিজরাতের সময় ঘনিয়ে এল। এই সময়ে আসমা ছিলেন গর্ভবতী। পেটে তার অনাগত বাচ্চা। কষ্টের কথা না ভেবেই তিনি হিজরাতের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়লেন।
মক্কা থেকে মদিনা।
কম দূরের পথ নয়।
কম কষ্টের পথ নয়।

www.nagorikpathagar.org

তবুও আসমা ভেঙে পড়লেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই যে ছিল তার একমাত্র কাম্য!
কুবা পৌঁছার পরই আসমা প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন।
ভূমিষ্ঠ হলো এক পুত্রসন্তান।
নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।
মদিনার মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম সন্তান-বয়ে গেল এক আনন্দের জোয়ার।
তাকবির ধ্বনিতে তারা ফেটে পড়লেন উল্লাসে।
সদ্যভূমিষ্ঠ আবদুল্লাহকে বুকে জড়িয়ে আসমা চললেন রাসূলের (সা) কাছে।
আবদুল্লাহকে দেখে রাসূল (সা) কী যে খুশি হলেন! ছেলেটিকে আসমা তুলে দিলেন রাসূলের (সা) কোলে। রাসূল দেরি না করেই নিজের মুখের কিছু থুতু নিয়ে আবদুল্লাহর মুখে দিলেন এবং তার জন্য প্রাণ খুলে দুয়া করলেন আল্লাহর দরবারে।

আবদুল্লাহর মুখে দুনিয়ার অন্য কোনো খাদ্যবস্তু প্রবেশের আগেই রাসূলের পবিত্র থুতু প্রবেশ করেছিল।
এই দিক থেকেও আবদুল্লাহ ছিলেন সৌভাগ্যবান। পরে তিনিও তো হয়েছিলেন একজন দুঃসাহসী মুজাহিদ।
ইসলামের জন্য আসমার অবদান ছিল অসামান্য। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সঙ্কটকালে তিনি যে ধরনের বুদ্ধিমত্তা আর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। ইতিহাসেও তা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

রাসূল (সা) যখন আবু বকরকে (রা) নিয়ে হিজরত করতে গেলেন। খবরটি মক্কায় ছড়িয়ে যাবার সাথে সাথে ক্ষেপে উঠলো নরাধম আবু জেহেল।
মুহূর্তেই সে ছুটে গেল আবু বকরের (রা) বাড়িতে। আসমাকে (রা) সামনে পেয়ে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, তোমার আব্বা কোথায়?
আসমা দৃঢ়তার সাথে বললেন, না–বলবো না।
ব্যাস্! সাথে সাথে পাপিষ্ঠ আবু জেহেল জোরে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দিলো আসমার কচি গালে।
এমন জোরে থাপ্পড়টি সে মেরেছিল যে, ছিটকে পড়ে গেল আসমার কানের দুল। কী ভয়ানক দৃশ্য!
হিজরাতের সময় রাসূল (সা) ও পিতা আবু বকর (রা) আশ্রয় নিয়েছিলেন সাওর পর্বতের নির্জন ও বিপদসঙ্কুল গুহায়।

www.nagorikpathagar.org

এই সময়ে, রাতের অন্ধকারে আসমা তাঁদের জন্য খাবার ও পানীয় বয়ে নিয়ে যেতেন সেখানে একাকী। চুপে চুপে।
তার হৃদয়ে কোনো ভয় ছিল না, ছিল না কোনো শঙ্কার লেশমাত্র।
সময় গড়িয়ে গেছে অনেক।
কালের পিঠে পড়ে আছে বহু ক্ষত-বিক্ষত স্মৃতিবাহী চিহ্ন। আসমার বয়সও সেই সাথে বেড়ে গেছে। বুকে ধারণ করে আছেন বহু স্মৃতিবাহী ঘটনা।
রাসূল (সা) নেই। নেই পিতা আবু বকরও। সময়ের ব্যবধানে একে একে সবাই চলে গেছেন।
সময় গড়িয়ে গেছে। আর সেই সাথে গড়িয়ে চলেছে কাল ও ইতিহাসের চাকাও।
হযরত আলীর খিলাফতকালও শেষ। ইন্তেকাল করেছেন উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াও।

তার মৃত্যুর পর হিজাজ, মিসর, ইরাক ও খুরাসানসহ সিরিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলের লোক আসমার পুত্র আবদুল্লাহকে খলিফা বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এতে ক্ষেপে উঠলো উমাইয়া রাজবংশ।
আবদুল্লাহকে দমনের জন্য তারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী পাঠালো।
যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দুই পক্ষের মধ্যে। এক সময় আবদুল্লাহর বাহিনী অনেকেই দলত্যাগ করে চলে গেলেন বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখে। বাকিদের নিয়ে আবদুল্লাহ আশ্রয় নিলেন কাবার হারাম শরীফে। সামনেই চূড়ান্ত সংঘর্ষ।
আবদুল্লাহ এই সময়ে ছুটে গেলেন প্রাণপ্রিয় মায়ের কাছে।

আসমা তখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। চোখেও দেখতে পান না। তবুও আবদুল্লাহ মায়ের সাথে শেষ পরামর্শের জন্য ছুটে এসেছেন। তাকে দেখেই আসমা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! তুমি এখন এখানে কেন? হাজ্জাজ বাহিনীরা হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করছে, আর তুমি ছুটে এসেছো এখানে!
আবদুল্লাহ বললেন, আপনার সাথে পরামর্শের জন্য এসেছি। এখন আমি কী করবো, বলে দিন আম্মা!
–পরামর্শ? কোন্ বিষয়ে? জিজ্ঞেস করলেন আসমা।
আবদুল্লাহ বললেন, হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রলোভনে আমার দলের

www.nagorikpathagar.org

অনেকেই চলে গেছে আমাকে ছেড়ে।
এমনকি আমার সন্তানও আমার পরিবারের লোকেরাও পরিত্যাগ করেছে আমাকে। এখন আমার সাথে অল্প কিছু লোক আছে।
তারা যত সাহসীই হোক না কেন, হাজ্জাজের শক্তিশালী বাহিনীর সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না।
এদিকে উমাইয়া প্রস্তাব পাঠাচ্ছে, আমি যদি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে খলিফা বলে মেনে নিই, যদি তার হাতে বাইয়াত হই তাহলে সে আমাকে অনেক সম্পদ ও পার্থিব সুখ ভোগের ব্যবস্থা করবে।
আমি যা চাইবো, সে তাই দেবে। এখন আপনিই বলুন আম্মা, আমি কি করবো?

হযরত আসমা ধৈর্যের সাথে শুনলেন পুত্র আবদুল্লাহর কথা। তারপর দৃঢ়তার সাথে বললেন, ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজস্ব। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জান।
যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে, তুমি সত্যের পথে আছ এবং সন্ধিক্ষণে হকের পথে আহবান করছো, তাহলে তোমার পতাকাতলে থেকে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, তুমিও তাদের মতো অটল থাকো।

আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের লোভের প্রত্যাশী হও, তাহলে বলবো–তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার সাথীদেরকে ধ্বংস করেছো।
আবদুল্লাহ বললেন, যুদ্ধ চালিয়ে গেলে নিশ্চিত আজ আমি মারা যাব। আসমা জবাবে বললেন, হাজ্জাজের কাছে তুমি স্বেচ্ছায় আত্মসম্পর্ণ করবে এবং তার দলের ছেলেরা তোমার মস্তক নিয়ে খেলা করবে। তার চেয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়াই উত্তম।

আবদুল্লাহ বললেন, আম্মা! আমি মরতে ভয় পাচ্ছি না মোটেও। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার হাত-পা কেটে আমাকে বিকৃত করে ফেলবে!
পুত্রের কথা শুনে আসমার কণ্ঠে বেজে উঠলো আবারো সাহস ও দৃঢ়তার বজ্রধ্বনি : নিহত হবার পর মানুষের ভয়ের আর কিছুই নেই।
কারণ, জবেহ করা ছাগলের চামড়া তোলার সময় সে আদৌ কষ্ট পায় না।
মায়ের কথায় বেড়ে গেল আবদুল্লাহর মনের জোর। শাহাদাতের স্বপ্নে তখন

www.nagorikpathagar.org

তিনি বিভোর। তিনি দ্রুত চললেন যুদ্ধের দিকে।
আসমা বললেন, তুমি আমার কাছে একটু এসো। শেষ বারের মত তোমাকে একটু স্পর্শ করি এবং তোমার শরীরের গন্ধ নিই।
আবদুল্লাহ আম্মার কাছে এগিয়ে এলে তার শরীরে হাত রেখে আদর করেছিলেন। মায়ের স্নেহের পরশে শিউরে উঠলো আবদুল্লাহর শরীর। একটু পরে আসমা বললেন, একি! তুমি এসব কী পরেছ? আবদুল্লাহ বললেন, আমার বর্ম।

আসমা প্রশান্ত মুখে হেসে বললেন, বৎস!
যারা শাহাদাতের পিয়াসী হয়, এটা তাদের পোশাক নয়। তুমি এটা খুলে ফেল।
তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সাহসিকতা আর আক্রমণের পক্ষে উচিত কাজ হবে এমনটিই। তা ছাড়া এটা হবে তোমার কর্মতৎপরতা, গতি ও চলাফেরার পক্ষে সহজতর।
বরং এর পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পর। তাহলে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেয়া হলেও তোমার সতর থাকবে অপ্রকাশিত।

মায়ের নির্দেশ মতো আবদুল্লাহ বর্ম খুলে পাজামা পরলেন। তারপর হারাম শরীফের দিকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য পা বাড়াবার আগে বললেন, আম্মা, আমার জন্য একটু দুয়া করে দিন।
বয়োবৃদ্ধ, অন্ধ আসমা সাথে সাথে হাত উঠালেন আল্লাহর দরবারে। বললেন :
'হে আল্লাহ! রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন তার জেগে জেগে দীর্ঘ ইবাদাত ও উচ্চকণ্ঠে কান্নার জন্য আপনি তার ওপর রহম করুন।

হে আল্লাহ রোজা অবস্থায় মক্কা ও মদিনাতে মধ্যাহ্নকালীন ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য তার ওপর রহম করুন।
হে আল্লাহ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের জন্য তার প্রতি আপনি করুণা বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আমি তাকে আপনারই কাছে সোপর্দ করছি, তার জন্য আপনি যে ফয়সালা করবেন তাতেই আমি রাজি। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।'
মায়ের দুয়া নিয়ে আবদুল্লাহ চলে গেলেন যুদ্ধে। এবং শহীদ হলেন।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহকে শহীদ করার পর হাজ্জাজ তার লাশটিকে শূলিতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তার মা আসমা এলেন ছেলের পাশে। শূলে লটকানো ছেলের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্ত ও স্থির কণ্ঠে বললেন,

'এ সওয়ারিকে এখনো ঘোড়া থেকে নামার সময় হলো না!'

হাজ্জাজ এগিয়ে এলো আসমার কাছে। হেসে বললো, বলুনতো আপনার ছেলের সাথে কেমন ব্যবহার করেছি?

দৃঢ়তার সাথে আসমা, একজন সদ্য শহীদের মা বললেন, 'তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো।

আর সে তোমার পরকাল নষ্ট করেছে। তুমি তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' বলে নাকি ঠাট্টা করেছো। আল্লাহর কসম, আমিই 'যাতুন নিতাকাইন।'

একটি নিতাক নিয়ে আমি রাসূল (সা) ও আমার পিতা আবু বকরের খাবার বেঁধেছি। আর একটি নিতাক আমার কোমরেই আছে।

মনে রেখ, রাসূলের (সা) কাছ থেকে শুনেছি, সাকিফ বংশে একজন মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং একজন জালিম পয়দা হবে। মিথ্যাবাদীকে তো আগেই দেখেছি। আর সেই জালিমটা হচ্ছো তুমি।"

এই হচ্ছেন দুঃসাহসিনী এক মা-হযরত আসমা (রা)। শহীদ পুত্রের বীভৎস দৃশ্যের সামনেও যিনি সমান শ্রান্ত, শান্ত এবং স্থির এক সাওর পর্বত।

www.nagorikpathagar.org

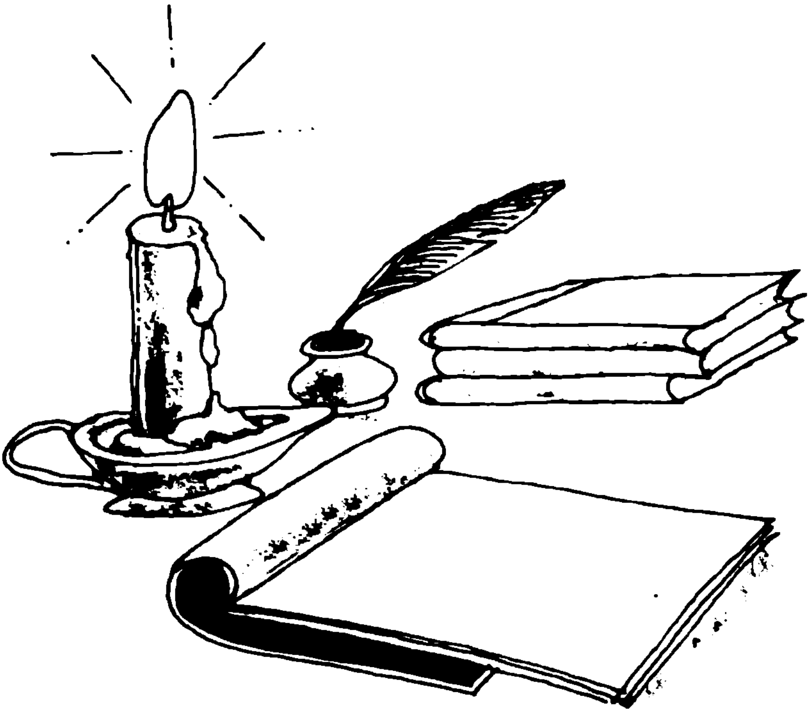

আলোর মিছিলে মহান কবি

আরবের এক বিখ্যাত কবি।
সর্বত্রই তাঁর নামের খ্যাতি।
এক নামে সবাই তাঁকে চেনে।
আরবের মানুষ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাঁকে।
নাম তাঁর–কবি লাবিদ!
আরবের বিখ্যাত কবিকুলের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি।
গোটা আরব জুড়ে বইছে তার সুখ্যাতির সুবাতাস।
আরববাসীর মুখে মুখে তার নাম।
প্রতি মুহূর্তে উচ্চারিত হয় তার কবিতার পঙ্‌ক্তি।
সেই বিখ্যাত কবি লাবিদ।–
তখনও আঁধার ফুঁড়ে আলো আসেনি তার সামনে।
সময়টা যে জাহেলি যুগ!

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু সত্য সন্ধানী লাবিদ। তিনি প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেন। ঠিক একজন কবির মতই। আর ভাবতে থাকেন। ভাবতে থাকেন একূল–ওকূল। এত খ্যাতি, এত নামডাক তাতেও কবির মন ভরে না। বরং কী এক তৃষ্ণার যাতনায় তিনি কেবল সারাক্ষণই তড়পান।

কী সেই তৃষ্ণা?

কী সেই যাতনা?

সে কেবল আলোর তৃষ্ণা।

তার আলো চাই। সত্যের আলো। যে আলোতে আলোকিত হতে পারেন কবি ও তার কবিতা!

লাবিদ তখন কবি খ্যাতির উচ্চাসনে আরোহণ করেছিলেন।

প্রাক-ইসলামী কাব্যজগতে তখন তাঁর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

তিনি আরব্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপে পরিচিত ছিলেন।

সেই সময় তাঁর কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে। প্রায় শতবর্ষ বয়সী কবি লাবিদ তাঁর গোত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় গমন করে রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তিনি আল কুরআন এই সমস্ত আয়াতের আবৃত্তি মন দিয়ে শোনেন।–

তারই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে, কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সুপথগামীও নয়।

তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মত, যে অগ্নি প্রজ্বলিত করল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ্ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন আর তাদের ফেলে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়।

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। অথবা তাদের উপমা আকাশ হতে মুষলধারে ভারি বর্ষণের মত, যাতে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক।

তারা বজ্রধ্বনি শ্রবণে মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণকুহরে আঙুল প্রবিষ্ট করায়। আর আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবেষ্টন করে আছেন।

বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অপহরণ করে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা সেই আলোতে পথ চলতে থাকে আর যখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তারা সম্যক দাঁড়িয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি হরণ করতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।
তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেন। যাতে তোমরা সংযমী হও। (সূরা আল বাকারা : ১৬-২১)

আল কুরআনের অনুপম ভাষা, অপূর্ব আলঙ্কারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা লাবিদকে এমনভাবে সম্মোহিত করে তুলেছিল যে, তখনই তিনি রাসূলের (সা) হস্তে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।
আমাদেরও ভেবে দেখা দরকার যে, কিভাবে লাবিদ (রা)-এর মত একজন উঁচুমানের খ্যাতিমান কবিও কুরআনের সম্মোহনী শক্তিবলে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন!

লাবিদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিঃসন্দেহে কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।
ইসলাম গ্রহণের পর পুলকিত লাবিদ। তিনি সমান শিহরিত ও আনন্দিত। তিনি সন্ধান পেলেন এমন এক রত্ন সম্ভারের, যার তুল্যমূল্য হিসাবের বাইরে। কি অসীম পাওয়া!-
একেবারেই আসমানের চাঁদ-রাসূলকে (সা) পেয়ে গেলেন কাছে, খুবই কাছে। আপন করে।
পেয়ে গেলেন আল কুরআনের সম্মোহনী জাদুর স্পর্শ।
আর ইসলামের ছায়াতলে যিনি আশ্রয় নেন, মহান রব তো তার সাথেই থাকেন।

একই সাথে এত প্রাপ্তি!-
আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে তার আরব সাগরের উচ্ছল ঢেউ।

মুহূর্তেই বদলে যান কবি। বদলে যায় তার কবিতার ধারাও।
যে হাত দিয়ে তিনি আগে লিখতেন শুধু আশাহত, স্বপ্নভঙ্গ, বিষাদ-বেদনা কিংবা প্রেমের কবিতা-সেই হাতেই এবার লিখতে থাকলেন আলো আর আলোর কাহিনী।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা) কবিতা পছন্দ করতেন।
ভালোবাসতেন কবিকেও।
রাসূলের (সা) সেই ভালোবাসার অতি প্রিয় কবিদের দলে যুক্ত হলেন আর এক বিখ্যাত কবি লাবিদ।
ফিরে এলেন গাঢ়তর অন্ধকার থেকে জোছনা প্লাবিত এক আশ্চর্য সুন্দর জীবনে।

শামিল হয়ে গেলেন প্রখ্যাত কবি লাবিদ আলোর মিছিলে।
কী সৌভাগ্যবান কবি!
তাঁর মতো আলোকিত জীবন গড়তে এসো আমরাও শপথ গ্রহণ করি।